সভ্যতার ইতিবৃত্ত

[মধ্য যুগ]

ডঃ সুপ্রকাশ সান্যাল

Recommended by West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VII Vide Notification No. TB/VII/H/81/68 dated 8.1.81

সভ্যতার ইতিবৃত্ত

(মধ্য যুগ)

[সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস]

সুপ্রকাশ স্যান্যাল, এম. এ., পি. এইচ-ডি.
রীডার, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন অধ্যাপক ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মণ্ডহারবার, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব লেকচারার যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারত বুক এজেন্সি
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

নিবেদন

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পর্ষদের নতুন পাঠ্যসূচী অনুসারে রচিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যে প্রসঙ্গ স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়িয়ে থাকি তা' বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীতেও পড়ানো যেতে পারে, তবে পুস্তকের মান ও পড়ানোর পদ্ধতি নিশ্চয়ই একরকম হবে না। আমার ধারণা যে বিভিন্ন পুস্তক থেকে মালমসলা সংগ্রহ করে শিশুদের উপযোগী করে রচনা করতে পারলে তা' তাদের গ্রহণীয় হবে এবং তা' তাদের জানবার আগ্রহ বাড়াবে। এই পুস্তিকাতে আমি সে চেষ্টা আমার সাধ্যমত করেছি। কত দূর সফল হয়েছি তা' বিচারের ভার আমার নয়।

পর্ষদ্ পাঠ্যসূচীর সঙ্গে যে পুস্তকের তালিকা দিয়েছেন তা' আমি ব্যবহার করেছি। তাছাড়াও নিম্নলিখিত পুস্তক-পুস্তিকার সাহায্য নিয়েছি—(১) পর্ষদ বার্তা, নভেম্বর, ১৯৭৯, (২) রামশরণ শর্মা—ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজম্, কলিকাতা, ১৯৬৫ (৩) এড্উইন রেইশয়ার (Reischauer) ও জন ফেয়ারব্যাঙ্ক – ইষ্ট এশিয়া দি গ্রেট ট্র্যাডিশন, (জর্জ এ্যালেন ও আন্‌উইন, লণ্ডন, ১৯৬০ এর সংস্করণ) (৪) ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ সংস্করণ, (৫) অধ্যাপক এ-জে ম্যান্‌ফ্রেড্ সম্পাদিত এ শর্ট হিষ্ট্রি অব্ দি ওয়ার্ল্ড প্রথম খণ্ড, ১৯৭৪ সংস্করণ, (৬) এইচ্ এস্ লুকাস—দি স্টোরী অব সিভিলাইজেশন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৩ সংস্করণ।

প্রকাশক, মুদ্রক, শিল্পী, শিক্ষকবন্ধুরা—যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এই পুস্তিকা প্রকাশ করাই যেতো না তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

শ্রীরামপুর, হুগলী
৩০শে মে, ১৯৮০

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় | মধ্যযুগ কথার অর্থ

'মধ্যযুগ' বল্‌লেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে একটা অবস্থা এবং সেই অবস্থার সময়সীমা। মনে হয় যে এই সময়ে এমন একটা অবস্থা ছিল যা তার আগের ও পরের অবস্থা থেকে আলাদা।

প্রথম পাঠ : ইউরোপে মধ্যযুগ

ইউরোপের ইতিহাস সম্পর্কে "মধ্যযুগ" ধারণাটির উদ্ভব হয় সপ্তদশ শতকের পণ্ডিতদের রচনা থেকে। তাঁরা মনে করতেন, পশ্চিমী রোমান সাম্রাজ্যের বিনাশ (৪৭৬ খ্রীঃ) মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিপর্যয়, কারণ এর ফলে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অবদানগুলি নষ্ট হয়। তুর্কী আক্রমণে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতনের (১৪৫৩ খ্রীঃ) পর সেখানকার জ্ঞানীগুণীরা ইউরোপে ফিরে আসেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে প্রাচীন সভ্যতার অবদানগুলির, বিশেষ করে স্বাধীন চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদের পুনর্জীবন ঘটে। তাই তাঁরা প্রাচীন সভ্যতার বিনাশ ও আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভের অন্তর্বর্তী যুগকে অর্থাৎ ৪৭৬ থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ বলে অভিহিত করতেন।

আধুনিক পণ্ডিতেরা এই ব্যাখ্যা মানেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগ বলতে যুগ পরিবর্তনের কাল অর্থাৎ এই সময়ে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন কাল আধুনিক যুগে রূপান্তরিত হয়।

মধ্যযুগের প্রধান চিহ্ন হ'লো সামন্ততন্ত্র। এই ব্যবস্থাতে সমস্ত শাসন-কাঠামো ছিল ভূমির ভিত্তিতে সংগঠিত। রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা বড় বড় সামন্তদের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল আর রাজাদের শক্তি স্বভাবতঃই ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু একচ্ছত্র সম্রাটের কল্পনা মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি। তখন শস্য উৎপন্নকারী ভূমিদাসেরা ভূমির সঙ্গে যুক্ত থাকতো আর তাদের খাজনা উৎপন্ন দ্রব্য ও দৈহিক

পরিশ্রমের মাধ্যমে ভূ-স্বামীদের দিতো। এঁরাই ছিলেন জমির মালিক আর এই সম্প্রদায়ের স্থান ছিল রাজা বা সামন্ত ও ভূমিদাসদের মাঝখানে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ সমস্ত পণ্যদ্রব্য নির্মাণ বা উৎপন্ন করা হ'তো স্থানীয় কৃষক ও প্রভুদের ব্যবহারের জন্য, বাজারে বিক্রীর উদ্দেশ্যে নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাচীন যুগের ক্রীতদাস-নির্ভর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চাইতে প্রগতিশীল। মধ্যযুগে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ওপর গির্জার প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ধর্মের অনুশাসনে মানুষের জীবন এত বেশী শৃঙ্খলিত হয় যে মানুষ ভাবতেই পারতো না যে তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তার কাছে ইহলোকের চাইতে পরলোকের চিন্তা ছিল অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

তবে এ যুগে গ্রীস ও রোমের চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নি আর সভ্যতার অগ্রগতিতে ছেদও পড়ে নি। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও চিন্তাপ্রবাহ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে নতুন রূপ নেয়। আজকাল সভ্যতার রূপান্তরের প্রারম্ভ হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে মধ্যযুগের সূচনা ধরা হয়। যেহেতু কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার নতুন সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও অর্থনীতির বিকাশ সূচিত করে তাই ৪৭৬ থেকে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে পরিচিত।

দ্বিতীয় পাঠ : ভারতে মধ্যযুগ

আগেকার ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটাই মত ছিল যে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে তার অবসান অর্থাৎ ১০০০ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সময় হচ্ছে ভারতের মধ্যযুগ। কিন্তু এইভাবে যুগবিভাগ করলে রাজবংশ ও রাজধর্মের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো আর জনসাধারণের মানসিকতাকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়। তাই সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকদের অভিমত হ'লো যে হূণ আক্রমণ যখন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত টলিয়ে দিয়ে ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত করে তখন থেকেই অর্থাৎ পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি থেকে মধ্যযুগের সূচনা হয়। ইউরোপের মত ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও ভারতীয়দের মনোভাব ধর্মের অনুশাসনে শৃঙ্খলিত হয়। ভারতও খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে আর রাজাদের ক্ষমতাও হয়ে যায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু নরপতিদের মনে একচ্ছত্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকে যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষে ভারতের ইতিহাসে আধুনিক যুগের কতকগুলি লক্ষণ ফুটে ওঠে, যেমন সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ক্ষয়, ধর্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রয়াস, সহনশীলতা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতিপত্তি হ্রাস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। যেহেতু ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে পদার্পণ নতুন ভাবধারায় পুষ্ট ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র রচনা করে এবং আধুনিক যুগের লক্ষণগুলিকে বিকশিত হ'তে সাহায্য করে, তাই ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মধ্যযুগের অবসান ধরা হয়।

তৃতীয় পাঠ : যুগবিভাগ ও মধ্যযুগের গতিপ্রকৃতি

যুগবিভাগ : কোন একটি ঘটনাকে সন তারিখ দিয়ে সুচিহ্নিত করা যায়, কিন্তু কোন যুগের সূচনা ও সমাপ্তি এইভাবে সূচিত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে যেমন নিঃশব্দে ঋতু পরিবর্তন হয়, তেমনি সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অগোচরে ও অলক্ষিতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবুও বোঝাবার সুবিধার জন্য গতিময় ও পরিবর্তনশীল ইতিহাসকে সময়ের মাপকাঠি দিয়ে ভাগ করতেই হয়।

গতিপ্রকৃতি : সাধারণভাবে বলতে গেলে মধ্যযুগের লক্ষণগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে বা একই সময়ে ফুটে ওঠে নি। যে সামন্ততন্ত্রকে আজকাল আমরা মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলি, তার বিকাশ চীনদেশে চাও যুগে (খ্রীঃ পূঃ ১১২২—২৫০) দেখা যায়। আবার ভারতে দ্বিতীয় শতকে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর ভূমি অনুদানের

মধ্যে সামন্ততন্ত্রের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে ভারতে ও চীনে মধ্যযুগের মানসিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সুস্পষ্ট ছিল। রাশিয়ার মহান পিটারের রাজত্বকাল (১৭২৫ খ্রীঃ) অবধি মধ্যযুগের সমস্ত লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করেছে।

আবার যে সব লক্ষণ মধ্যযুগের অবসান ঘটায় তারও প্রকাশ বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়েছে। ইউরোপের ভেনিস্ নগরীতে মধ্যযুগের কোন লক্ষণই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নি। যে নগরের প্রতিষ্ঠা ও বিত্তশালী পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের উত্থান মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কুঠারাঘাত হানে তা ত' একাদশ শতক থেকেই দক্ষিণ ইউরোপে আরম্ভ হয়। আবার যে রেনেসাঁস ইউরোপের চিন্তাধারায় ফাটল ধরায় তার সূচনা দ্বাদশ শতকেই দেখা যায়।

মানুষের ইতিহাসে মানুষ বহুবিধ ও বিচিত্র। তাই কিছু স্থানে এমন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করতে পারে বা কিছু মানুষের মানসিকতা এমন হতে পারে যখন পৃথিবীর অন্য স্থানে বা অন্য মানুষের মনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। সভ্যতার ইতিহাস সতত গতিময় আর ফেলে আসা দিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের ইতিহাসের সংকেত।

অনুশীলনী

(১) ভারতের ইতিহাসে কোন্ সময়কে মধ্যযুগ বলা হয়?

(২) মুসলমান যুগকে ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগ বললে কী ভুল হয়?

(৩) ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের দু'টি লক্ষণ নির্দেশ কর।

(৪) সভ্যতার ইতিহাসে যুগ বিভাগ কেন করা হয়?

(৫) ইউরোপে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে আধুনিক যুগের দু'টি লক্ষণ নির্দেশ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় | পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ

প্রথম পাঠ : জার্মাণ উপজাতিদের চাপে রোমান সাম্রাজ্যের পতন

হূণদের আবির্ভাব : মধ্য এশিয়ার তৃণভূমির মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত যাযাবর হূণেরা নতুন পশুচারণভূমির সন্ধানে নানা দেশ পরিভ্রমণ ক'রে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। এরা দেখতে ছিল কদাকার আর তাদের আচার-ব্যবহার ছিল ততোধিক বীভৎস। ঘোড়ার পিঠ ছিল তাদের দেশ আর যুদ্ধ ছিল তাদের কাছে মজার ব্যাপার। নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

হূণদের চাপে জার্মাণ উপজাতির স্থানান্তর গমন : আনুমাণিক ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে হূণেরা অস্ট্রো (পূর্বদেশীয়) গথ নামক জার্মাণ উপজাতিকে ইউক্রেণে (বর্তমান রাশিয়ায়) আক্রমণ করে। ওরা পালিয়ে এলো ভিসি (পশ্চিমী) গথদের দেশে। হূণ আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত ও নবাগতদের চাপে বিব্রত হয়ে পশ্চিমী গথেরা রোমান কর্তৃপক্ষের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলো। রোমান সম্রাট ভালেন্স কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে তাদের ডানিয়ুব নদীর দক্ষিণ তীরে বসবাস করবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রোমান অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হ'লো। এ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে (৩৭৮ খ্রীঃ) দুই-তৃতীয়াংশ রোমান সৈন্যবাহিনী সহ ভালেন্স নিহত হলেন। বিজয়ী গথেরা কৃষ্ণসাগর থেকে ইটালীর সীমান্ত পর্যন্ত ধ্বংসলীলা চালালো। এদিকে ডানিয়ুব-রাইন সীমান্তের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার ফলে দলে দলে উপজাতিরা, যথা ভ্যানডল, সৌভি, বার্গেণ্ডিয়ান, এ্যালাম্নি প্রভৃতি বাসভূমির সন্ধানে রোমান সাম্রাজ্যে আসতে লাগলো।

সম্রাট থিওডোসিয়াস (৩৭৯-৩৯৫ খ্রীঃ) তাদের দমন করা অসম্ভব

ভেবে অনেক গোষ্ঠীকে মিত্ররূপে সাম্রাজ্যে বসবাস করবার অনুমতি

দিলেন আর যোগ্য লোকেদের রোমান সৈন্যদলে ও রাজপদে নিযুক্ত করলেন।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন: কিন্তু সম্রাট হনোরিয়াস (৩৯৫-৪২৩ খ্রীঃ) পশ্চিমী গথদের অনুদান বন্ধ করে দিলেন। রোমান সৈন্যদল থেকে তাদের বরখাস্ত করা হ'লো। এর ফলে তারা অস্ত্রধারণ করলো এবং ইটালী বারবার আক্রান্ত হ'তে লাগলো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জার্মাণ উপজাতিরা অরাজকতা সৃষ্টি করতে লাগলো— কোথাও না কোথাও বিদ্রোহ লেগেই ছিল। রোমের এই দুর্দিনে রোমান সেনাধ্যক্ষ স্টিলিকো হনোরিয়াসের চক্রান্তে নিহত (৪০৮ খ্রীঃ) হলেন। স্টিলিকো জাতিতে ভ্যান্‌ডল হ'লেও অসম সাহসের সঙ্গে সাম্রাজ্যের পতন রোধ করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রোমেও কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা রইল না। পশ্চিমী গথ, ভ্যান্‌ডল প্রভৃতি জার্মাণ উপজাতিদের দ্বারা, এমন কি হূণদের দ্বারাও রোম আক্রান্ত হ'লো। র‍্যাভেনাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেও রক্ষা পাওয়া গেলো না। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাস্টাস্‌কে বিতাড়িত করে ওডেসার নামে একজন ভ্যান্‌ডল সেনাধ্যক্ষ রোমের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। ঐতিহাসিক রোমান সাম্রাজ্যের পতন হ'লো।

রোমান একতা ও আইনের আদর্শ: কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে তখনও রোমান সাম্রাজ্যের একটা অংশ টিকেছিল আর ওডেসার ও তাঁর পরবর্তী রাজা থিওডোরিক পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন করতেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব জার্মাণ উপজাতিরা রাজ্য কায়েম করে তাদের মনেও রোমান একতার আদর্শ বলবৎ ছিল। একতার সূত্রে সমস্ত রোমান সাম্রাজ্য গাঁথবার প্রচেষ্টা সারা মধ্যযুগ ধরেই হয়েছে। এই সব উপজাতিদের নিজেদের আইন প্রণালী ছিল কিন্তু তারা রোমান বিধিগুলি অস্বীকার করতে পারে নি। তারা রোমান আইন অনুসারেই দেশ শাসন করতো।

দ্বিতীয় পাঠঃ এ্যালারিক্, এ্যাটিলা ও গাইসেরিক

এ্যালারিকঃ সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর পশ্চিমী গথদের জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। এই সংকটের সময় তারা এ্যালারিককে রাজা (২৯৫-৪১০ খ্রীঃ) নির্বাচিত করে। তিনি তাঁর অনুচরদের বললেন যে দুর্বল রোমান সাম্রাজ্যের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করার চেয়ে তাদের উচিত নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তিনি গ্রীস বিধ্বস্ত করেন। সংযত করার জন্য তাঁকে ইলিরিকাম্ প্রদেশের প্রশাসক নিযুক্ত করা হ'লো।

এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ইটালীতে অনুচরবর্গকে নিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করবার জন্য ৪০১ খ্রীষ্টাব্দে এ্যালারিক্ ইটালী আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্রাট হনোরিয়াসের কাছে মোটা ঘুষ পেয়ে সেবারের মত তিনি ইটালী পরিত্যাগ করেন। সাত বছর পরে তিনি আবার ইটালী আক্রমণ করলে তাঁর কাছে শান্তির জন্য দূত পাঠানো হ'লো। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাধ্যক্ষের পদ দাবী করলেন। তাঁকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে তখনকার মতো ক্ষান্ত করা হ'লো। তবে তিনি তাঁর দাবীতে অটল রইলেন। এবারেও প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'লে তিনি রোম নগরী লুণ্ঠন করলেন। কিন্তু তিনি কোন ধর্মস্থান লুণ্ঠন করেন নি। রোমের বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে শস্যসমৃদ্ধ আফ্রিকার উপকূলে বসতির উদ্দেশে যাত্রা করবার জন্য যখন তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তাঁর মৃত্যু হ'লো (৪১০ খ্রীঃ)।

এ্যাটিলাঃ যে দুর্দান্ত হূণদের আক্রমণের ফলে ইউরোপের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন এ্যাটিলা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি তিনি কৃষ্ণসাগর ও এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল জয় করেন। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটও তাঁকে কর দিতে বাধ্য হয়। পশ্চিমের গলদেশও হূণবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু গথ, বার্গেণ্ডিয়ান ও রোমানেরা সমবেতভাবে হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং

চ্যালনের যুদ্ধে (৪৫১ খ্রীঃ) এ্যাটিলা পরাজিত হন। তিনি আক্রমণের গতি ফিরিয়ে ইটালীতে প্রবেশ করেন। এই দুঃসময়ে ধর্মগুরু লিও এ্যাটিলাকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন খ্রীষ্টধর্মের পীঠস্থান রোম ধ্বংস করা থেকে বিরত হন, না হ'লে ঈশ্বরের কোপদৃষ্টি তাঁর ওপর বর্ষিত হবে। এ্যাটিলা নিরস্ত হলেন। পর বৎসর (৪৫৩ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু হ'লো আর ইউরোপের হূণ সন্ত্রাস চিরতরে বন্ধ হ'লো।

গাইসেরিক ঃ ভ্যান্‌ডল উপজাতির ইতিহাসে গাইসেরিক একটি স্মরণীয় নাম। তিনি এক ক্রীতদাসের সন্তান, কিন্তু যোগ্যতার বলে রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নেতৃত্বে ভ্যান্‌ডলেরা আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলে (বর্তমান ত্রিপোলীতে) একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে তারা বেশ কিছুদিন স্পেনে বসবাস করেছিল। গাইসেরিক কার্থেজও জয় করেছিলেন। একটা শক্তিশালী নৌবহর গঠন করে তিনি স্পেন, ইটালী ও গ্রীসের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্য চালাতেন।

৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অধীনে একটি ভ্যান্‌ডল নৌবহর টাইবার নদী দিয়ে রোম নগরীতে উপস্থিত হয়। ধর্মগুরু লিও তাঁকে ধর্মের বাণী শুনিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তবুও তিনি লুণ্ঠন করার কোন সুযোগই ছাড়েন নি। চোদ্দ দিন ধরে অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে আর ত্রিশ হাজার অধিবাসীকে ক্রীতদাস করে গাইসেরিক দেশে ফিরে যান। ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তৃতীয় পাঠ ঃ জার্মাণ উপজাতিদের জীবন যাত্রা, রোমান সাম্রাজ্যে বসতি ও সভ্যতার সংমিশ্রণ

রাজনৈতিক জীবন ঃ শাসন পদ্ধতিতে জার্মাণ উপজাতিরা ছিল গণতান্ত্রিক। তবে প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য একজন রাজা নির্বাচিত করা হ'তো। উত্তরের জার্মাণ গোষ্ঠীগুলিতে এক একটি বিশেষ পরিবার থেকেই রাজা নির্বাচন করবার প্রথা ছিল। পশ্চিমের জার্মাণ গোষ্ঠীরা শুধু যুদ্ধের সময় একজনকে রাজা নির্বাচিত ক'রতো। প্রাচীন কাল থেকেই তাদের তিনটে রাজনৈতিক বিভাগ—গোষ্ঠী, দেশ ও গ্রাম ছিল।

সকল স্বাধীন প্রজাই এগুলির শাসনে অংশ গ্রহণ করতেন। সম্ভ্রান্তদের অভিমতকে স্বাধীন প্রজাদের অভিমতের মতই গুরুত্ব দেওয়া হ'তো।

সামাজিক জীবন: সামাজিক জীবনে জার্মাণ উপজাতিরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল – সম্ভ্রান্ত, স্বাধীন প্রজা ও ক্রীতদাস। ক্রীতদাস ছিল দু'ধরনের—ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত আর ব্যক্তিগত। ভূমিসংযুক্ত ক্রীতদাসের ভূমি ছাড়া আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। ব্যক্তিগত ক্রীতদাসেরা স্বাধীন প্রজাদের অস্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য হ'তো। তবে ক্রীতদাসদের কোন অমানুষিক দণ্ড দেবার অধিকার প্রভুদের ছিল না।

অর্থনৈতিক জীবন: শান্তির সময়ে তাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন, শিকার ও কৃষি। তাদের যাযাবর জীবনের মূলে ছিল অধিকাংশের কৃষি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। তাদের কৃষিকার্যের উপকরণগুলি ছিল প্রাথমিক স্তরের। তাই শুধু কৃষিকার্যের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। দারিদ্র্যের জন্যই তারা আকৃষ্ট হ'তো ঐশ্বর্যশালী রোমান সাম্রাজ্যের দিকে।

ধর্ম: ধর্মের ব্যাপারে এরা ছিল প্রকৃতি-উপাসক। এদের মধ্যে পুরোহিত-তন্ত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পরিবার বা গোষ্ঠীর বয়োঃজ্যেষ্ঠ লোকেরা পুরোহিতের কার্য সম্পন্ন করতেন। রোমান সাম্রাজ্য থেকে ধৃত বন্দীদের প্রভাবে এদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়। পূর্বদেশীয় গথদের মধ্যে উল্‌ফিলাস (৩১১-৩৮১ খ্রীঃ) নামে এক ব্যক্তি তাদের প্রথম ধর্মযাজক হন এবং পূর্বদেশীয় গথভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য জার্মাণ উপজাতিরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

রোমান সাম্রাজ্যে জার্মাণ বসতি: রোমান সাম্রাজ্যে সংকটের সময় ইংলণ্ড থেকে সৈন্য অপসারণ করা হয় এবং সেই সুযোগে সেখানে এ্যাঙ্গল, সাক্‌সন ও জুট গোষ্ঠীর লোকেরা আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তর গলদেশে বিভিন্ন ফ্রাঙ্ক গোষ্ঠী, এ্যালামনি ও বার্গেণ্ডিয়ানদের

আর দক্ষিণ গলদেশে পশ্চিমী গথদের বসতি স্থাপিত হয়। পরে
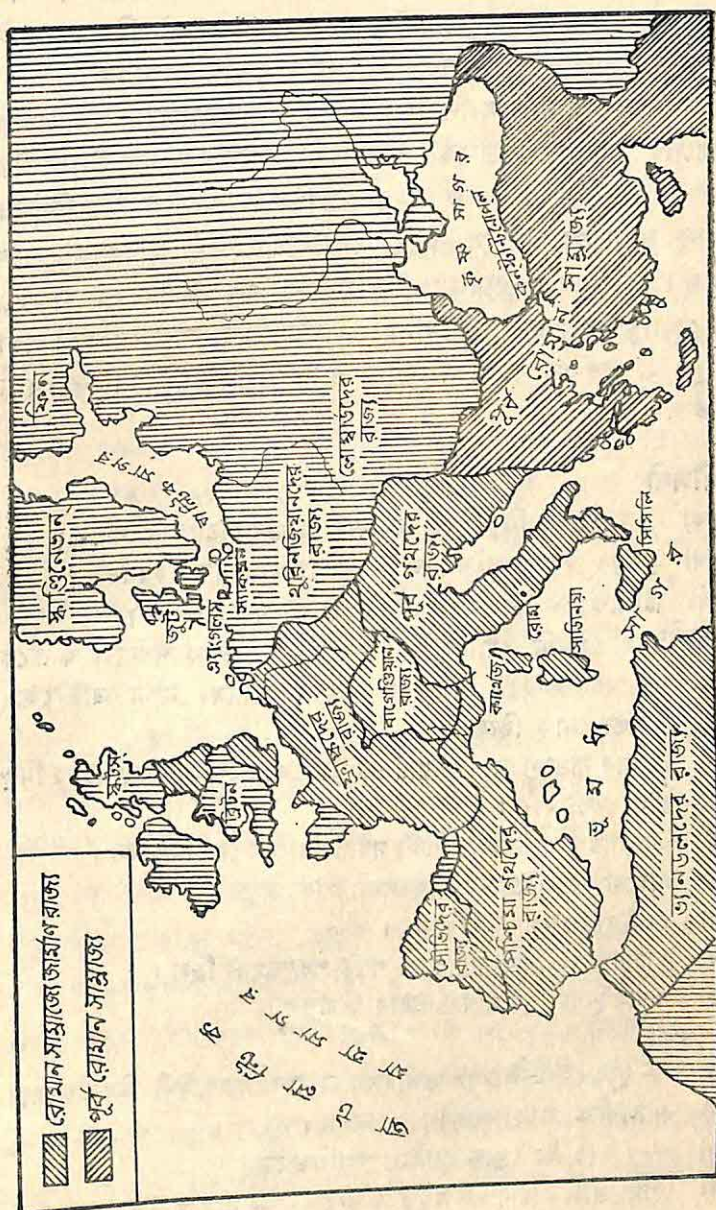
পশ্চিমী গথেরা স্পেনে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। ভ্যান্‌ডলরা প্রথমে স্পেনে ও পরে আফ্রিকার উপকূলে বসতি স্থাপন করে। ইটালীতে পূর্ব

গথদের প্রভুত্ব স্থায়ী হয়েছিল। জার্মাণ উপজাতিদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ আর রোমান সম্রাটের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই ছিল। তাই বসতির স্থানগুলিতে ওরা স্থায়িভাবে বসবাস করতে পারে নি।

রোমান সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রণ: জার্মাণ উপজাতিরা সব সময়ে শত্রুরূপেই রোমান সাম্রাজ্যে আসেনি। অনেক জার্মাণ উপজাতির লোকেরা রোমান সৈন্যদলে নিযুক্ত হয়েছিল। অনেকে মিত্র হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যে বসবাস ক'রে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার ভোগ করেছে। রোমের প্রভাবে নাগরিক সভ্যতা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম তাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। রোমানরাও জার্মাণদের অনুকরণ করে লম্বা লম্বা চুল রাখতে এবং ঢিলা পায়জামা ও নরম পশমের কোট পরিধান করতে লাগলো।

অনুশীলনী

১। (ক) জার্মাণ উপজাতিরা কেন দলে দলে রোমান সাম্রাজ্যে এসেছিল?

(খ) হূণদের দেখতে কেমন ছিল? তাদের স্বভাব কি রকম ছিল?

(গ) স্টিলিকো কে ছিলেন? তাঁর মৃত্যুর কী ফল হয়েছিল?

(ঘ) শেষ রোমান সম্রাটের কি নাম ছিল? তাঁকে অপসারণ করে কে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন? রোমের নতুন সম্রাট কোন্ জাতির লোক ছিলেন?

(ঙ) রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর তার কোন্ কোন্ ঐতিহ্য নষ্ট হয় নি?

২। ভুলগুলো কেটে দাও:

(ক) এ্যালারিক ভ্যান্ডল/পশ্চিমী গথ উপজাতির নেতা ছিলেন।

(খ) গাইসেরিক হূণ/ভ্যান্ডল ছিলেন।

(গ) এ্যাটিলা ভিসিগথ/হূণ ছিলেন।

(ঘ) জার্মাণ উপজাতিরা কৃষিকার্যে পশ্চাৎপদ/অগ্রসর ছিল।

(ঙ) প্রথমে হূণেরা/পূর্ব গথেরা খ্রীষ্টান হয়েছিল।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর:—

(ক) — যুদ্ধে (২৭৮ খ্রী:) দুই তৃতীয়াংশ রোমান সৈন্যবাহিনী নিহত হ'লো।

(খ) এ্যালারিক কোন — লুণ্ঠন করেন নি।

(গ) — (৪৫১ খ্রী:) যুদ্ধে এ্যাটিলা পরাজিত হন।

(ঘ) রোমানরাও জার্মাণদের অনুকরণ করে — — রাখতে এবং — — ও — — কোট পরিধান করতে লাগলো।

(ঙ) রোমান প্রভাবে — — এবং — তাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় | ইউরোপের ইতিহাসে তথাকথিত অন্ধকারময় যুগ।

প্রথম পাঠ : তথাকথিত অন্ধকারময় যুগ

ইউরোপে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত যুগকে পুরানো ঐতিহাসিকরা 'অন্ধকারময় যুগ' বলেন। রোমক সাম্রাজ্য তার শেষের দেড় শো বছর ধরে বৈদেশিক আক্রমণে বিব্রত ও আভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এই পতনশীল সাম্রাজ্য ও ঘুণধরা সমাজ যে সভ্যতার ইতিহাসে কোন অবদান রেখে যাবে তা' কল্পনাও করা যায় না। আবার রোমক সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর যে সব জার্মাণ উপজাতিরা নিজেদের ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাদের সভ্যতাও খুব একটা উন্নত ধরনের ছিল না এবং তারা সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে সব সময়েই প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকায় দেখা দেয় অস্থিরতা ও অশান্তি। এই অস্থিরতা ও অশান্তি প্রতিফলিত হয় সাংস্কৃতিক জীবনে। এই তিনশো বছরের মধ্যে রোমান সম্রাট অগাস্টাসের সময়কার ভার্জিলের মতো কোন কবি বা ত্রয়োদশ শতকের টমাস্ অ্যাকুইনাসের মতো কোন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন নি।

আধুনিক পণ্ডিতেরা চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক অবধি কালকে অন্ধকারময় বলে স্বীকার করেন না। একটা সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হ'তে অর্থাৎ সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে অনেক দিন সময় লাগে। তাই কোন যুগে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হয়নি এই অজুহাতে তাকে 'অন্ধকারময়' বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। আর মহামানব, বড় কবি, সার্থক সাহিত্যিক ও মহান শিল্পী প্রত্যেক শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করেন না; তাই বলে সেই শতাব্দীতে কোন সভ্যতা ছিল না বলা ঐতিহাসিকের ধর্ম নয়।

এ যুগে ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার

ও নতুনভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা পুরোদমে চলেছে। মানুষের সৃজনী শক্তিতে কোন ভাঁটা পড়ে নি। শিক্ষাদীক্ষার দীপ খ্রীষ্টান গির্জা ও মঠগুলিতে সমানেই জ্বলছিল। খ্রীষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে গ্রীক রোমক সভ্যতার সঙ্গে জার্মাণ উপজাতিদের সভ্যতার সংমিশ্রণে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছিল। খ্রীষ্টান ধর্মগুরু, যাজক ও মঠবাসী সন্ন্যাসীরা এই নতুন সভ্যতার হাতিয়ারগুলি নির্মাণ করছিলেন। জার্মাণ রাজারাও এই মহান যজ্ঞে পেছিয়ে ছিলেন না। তাই চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী অবধি সময়ে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। আর রাজ্য ভাঙাগড়ার কোন প্রভাব পূর্ব ইউরোপের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পড়ে নি।

দ্বিতীয় পাঠ : তথাকথিত অন্ধকারময় যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা : চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক অবধি ইউরোপীয় ইতিহাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয় নি। তবে তখন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল মঠ ও গির্জাগুলি। শিক্ষিত লোক বলতে বোঝাতো যাজক ও মঠের আবাসিকবৃন্দ। ধর্মপ্রচারকেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁদের এমন জ্ঞান থাকা দরকার যাতে তাঁরা কঠিন ধর্মশাস্ত্রগুলি সাধারণ লোককে বোঝাতে পারেন। এইজন্য মঠের আবাসিকরা ও যাজকেরা প্রথমে ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র এবং পরে জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করতেন। খ্রীষ্টান মঠগুলি যে বিদ্যানিকেতনে রূপান্তরিত হয় এতে ইটালীর ক্যাসিওডোরাসের দান অপরিসীম।

এ যুগে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অবদানগুলিও রক্ষা করা হয়েছিল। বোথিয়াস নানা দেশ থেকে এরিস্টট্লের রচিত অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করান। তাঁর রচিত "দর্শনের সান্ত্বনা" নামক গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিকের মনোভাব নিয়ে জীবন-মৃত্যুর সমস্যাকে দেখানো হয়েছে। ক্যাসিওডোরাস প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য সংরক্ষণ ও অনুলিপি করণের জন্য ভিভারিয়ামে

একটা মঠ নির্মাণ করেন। এই সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব যে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় নি—গ্রীসের ঐতিহ্য যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় নি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ক্যাসিওডোরাস ও বোথিয়াসের চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টা।

এ যুগে বিশ্বকোষ রচনার বিশেষ প্রবণতা দেখা দেয়। ইটালীর ক্যাসিওডোরাস ও স্পেনের ঈশিডোর বিশ্বকোষ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। এ যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্য কীর্তি হচ্ছে বিভিন্ন সাধুসন্তদের জীবনী। এই সমস্ত কাহিনী একত্রিত করে অধুনা "সাধুসন্তদের ক্রিয়াকলাপ" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। রোমে সাধু অগাস্টাইন এবং মহান গ্রেগরীর রচনায় একাধারে সাহিত্যের কীর্তি ও খ্রীষ্টানধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। গলদেশীয় কবি ফোরচুনাটাসের রচিত পুস্তকে মধ্যযুগের চিন্তাধারা সুললিত সুরে গীত হয়েছে।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এ যুগের নিজস্ব অবদান আছে। ট্যুরের গ্রেগরীর "ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস"-এ ৫৯১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তাদের কার্যকলাপ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ পাওয়া যায়। ক্যাসিওডোরাস গথদের ইতিহাস রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন।

তৃতীয় পাঠ : ধর্ম ও সাধারণ মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধ

যে যুগে সব কিছু পরিবর্তিত হচ্ছিল সে যুগে সুদৃঢ় পর্বতের মত একমাত্র অপরিবর্তনীয় ছিল রোমের গির্জা আর খ্রীষ্টধর্ম। এই সময়ে ধীরে ধীরে রোমের প্রধান ধর্মগুরুর ক্ষমতা ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। খ্রীষ্টধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চিন্তাধারা সঞ্চারিত করেছিল যে পৃথিবীতে মানুষ খুব অল্প দিনের জন্য বাস করে এবং পরের জীবন অনন্ত। ইহজীবনে মানুষ যদি পাপ করে তবে পরজীবনে তাকে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর যদি ভালো কাজ করে তা হ'লে অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারবে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করলে মানুষ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের আগে যা পাপ করেছে তা' স্খলন হয়ে যায় কিন্তু তার পরের পাপ-পুণ্যের জন্য সেই ব্যক্তিই দায়ী থাকে।

এই সময়ে ইউরোপের লোকেদের পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় বোধ বৃদ্ধি পায়। এ যুগের বিচার প্রথার মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে মানুষ অপকর্ম করতে ভয় পেতো।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন, যে সময়ে মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল, যে সময়ে শিক্ষা-দীক্ষার দীপ নেভে নি, প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য নষ্ট হয় নি এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান ছিল তাকে অন্ধকারময় যুগ বলা সত্যের অপলাপ।

অনুশীলনী

১। কোন মহাপুরুষ বা মহাকবি না জন্মালেই কী কোন যুগকে অন্ধকারময় বলা যায়?

২। কোন্ কোন্ কারণে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী অবধি সময়কে অন্ধকারময় যুগ বলা ঠিক নয়? তিনটি কারণ নির্দেশ কর।

৩। ক্যাসিওডোরাস, বোথিয়াস ও ট্যুরের গ্রেগরীর বিষয় দুই লাইনে লেখ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) বোথিয়াস রচিত — — গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিকের — নিয়ে — সমস্যা দেখা হয়েছে।

(খ) খ্রীষ্টান — গুলি যে — রূপান্তরিত হয় এতে ইটালীর — দান অপরিসীম।

(গ) এই সময়ে ইউরোপের লোকেদের — বোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে মানুষ — করতে ভয় পেতো।

চতুর্থ অধ্যায় | বাইজাণ্টাইন সভ্যতা

অনেকের ধারণা পশ্চিমী রোমক সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবার পরও প্রায় হাজার বছর রোমক সভ্যতার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে টিকেছিল পূর্ব রোমান বা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য। কিন্তু যে সভ্যতা এখানে গড়ে ওঠে তাতে রোমের প্রভাব ছিল নামমাত্র। এই সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা। খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত রোমক সভ্যতা গ্রীক ও প্রাচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে যে রূপ ধারণ করে তাকেই আমরা বলি বাইজাণ্টাইন সভ্যতা।

প্রথম পাঠ : কন্‌স্টাণ্টিনোপ্‌লের প্রতিষ্ঠা ও রাজধর্মরূপে খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি

সুদূর প্রসারিত রোমান সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবার জন্য সম্রাট কন্‌স্টাণ্টাইনের মনে আর একটা রাজধানী স্থাপনের কথা জাগে। ডানিয়ুব নদীর উত্তরের অধিবাসী এবং ইউফ্রেটিজ্ নদীর পূর্বের রাজতন্ত্রের কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। তা' ছাড়া হাঙ্গেরীর ইলিরিকাম্ প্রদেশ থেকেই রোমক সাম্রাজ্য তার শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের সংগ্রহ করতো। তাই এশিয়া ও ইউরোপের সীমানায় একটা রোমান রাজধানী গড়ে তোলবার যথেষ্ট সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক কারণ ছিল।

কন্‌স্টাণ্টাইন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে খ্রীষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মের সহায়তায় রাজশক্তি বৃদ্ধি করতে চাইতেন। কিন্তু রোমে খ্রীষ্টধর্মের প্রসার হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে। কাজেই তাঁর পক্ষে রোমের খ্রীষ্টানদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়। তা' ছাড়া রোমে বহুদিন ধরে প্রকৃতি-উপাসক পৌত্তলিকদের আধিপত্য ছিল। বহুলোক তখনও ছিল প্রকৃতি-উপাসক। তাই তিনি মনস্থ করলেন একটা নতুন রাজধানী স্থাপন করতে আর রাজধানী প্রতিষ্ঠার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হ'লো বাইজাণ্টিয়াম্

নামে বস্‌ফোরাস প্রণালীর তীরে প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত ৬৫৭ (মতান্তরে ৬৬০) খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে স্থাপিত এক গ্রীক উপনিবেশ।

৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই নগর পত্তনের কাজ আরম্ভ হয়। ছয় বৎসর অগণিত লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমে "নতুন রোম" নগরী নির্মিত হয়। ১১ই মে ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর খ্রীষ্টের নামে উৎসর্গ করা হয়। "প্রকৃতি উপাসনা"র অবসান ঘোষিত হয়। দুই শতাব্দীর মধ্যে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সুসভ্য নগরীতে পরিণত হয়। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য জাষ্টিনিয়ানের প্রচেষ্টা

জাষ্টিনিয়ান ছিলেন ইলিরিকামের অধিবাসী। এই প্রদেশের অনেকেই রোমের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁর বাসনা ছিল জার্মাণ বিজেতাদের রোম এবং একদা রোমান শাসিত সকল দেশ থেকে বিতাড়িত করে সমস্ত রাষ্ট্রকে একই আইন ও একই খ্রীষ্টধর্মের যোগসূত্রে গাঁথবার। তাঁর দৃষ্টিতে পশ্চিম ইউরোপ, ইটালী ও আফ্রিকার জার্মাণ উপজাতিসমূহের রাজ্যগুলিই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার নিদর্শন; আর এই রাজারা ছিলেন জবরদখলকারী।

জাষ্টিনিয়ান

জাষ্টিনিয়ান ছিলেন খ্রীষ্টান আর জার্মাণ উপজাতিরা ছিল আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অধিবাসী এরিয়াসের মতের সমর্থক। এরিয়াস্ যিশুকে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে যোগাযোগকারী পুরুষ বলে মনে করতেন। গোঁড়া খ্রীষ্টান জাষ্টিনিয়ানের কাছে জার্মাণ উপজাতিরা ছিল বিধর্মী। তাই তিনি রোমান সাম্রাজ্যের হৃত প্রদেশগুলি উদ্ধার করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা সফল হয়

নি। তিনি ভ্যান্‌ডল রাজ্য ধ্বংস করে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে বাইজাণ্টাইন প্রভুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। আঠারো বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করে তিনি পূর্ব গথদের ইটালী থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় সমস্ত ইটালীতে লোম্বার্ড প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। শুধু ইটালীর দক্ষিণাঞ্চলের অংশ বিশেষে প্রায় পাঁচ শো বছর বাইজাণ্টাইন আধিপত্য বজায় ছিল। স্পেনে তিনি আংশিক কৃতকার্য হ'লেও পশ্চিমী গথ শক্তি একটুও হ্রাস পায় নি আর গলদেশে ফ্রাঙ্ক ক্ষমতা ছিল অটুট। অবিরত যুদ্ধের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং সৈন্যরা হারায় তাদের মনোবল ও সামর্থ্য।

তৃতীয় পাঠ ঃ জাষ্টিনিয়ানের সংহিতা

রোমান বিধির জটিলতা দূর করবার জন্য দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস্ যে সংহিতা রচনা (৪৩৮ খ্রীঃ) করেছিলেন তা' তাঁর আমলের পক্ষেই অনেক ব্যাপারে অসম্পূর্ণ ছিল আর তা' পরিবর্তিত পরিবেশে একেবারে অচল হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ অনেক পরিমাণে উদার হয়ে পড়েছিল এবং এর সঙ্গে প্রচলিত সংহিতা খাপ খেতো না। আবার গ্রীক ভাবধারায় পুষ্ট বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে অনেক রোমান বিধি প্রয়োগ করতে অসুবিধাও হ'তো।

রোমক বিধিগুলিকে পদ্ধতিবদ্ধ, ব্যাখ্যা ও সংস্কার করবার জন্য জাষ্টিনিয়ান তাঁর মন্ত্রী ট্রীবোনিয়ানের অধীনে দশ জন আইনজ্ঞ নিযুক্ত করলেন। তাঁরা ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিধান-সংহিতা রচনা করলেন। এর নাম "কোডেক্‌স্ কন্‌ষ্টিটিউশনিস্"। এতে সম্রাট হাড্রিয়ানের আমল থেকে জাষ্টিনিয়ানের আমল পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত সংবিধিগুলিকে (লিখিত আইন) বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে যে আইনগুলি চালু থাকবে সেইগুলির নির্দেশ করা হ'লো। তারপর তিন বৎসর পরিশ্রম করে তাঁরা আর একটি পুস্তক প্রকাশ করলেন। এর নাম "ডাইজেস্ট"। জাষ্টিনিয়ানের আমল পর্যন্ত বিধি-বিশারদদের প্রদত্ত প্রয়োজনীয়

অভিমতগুলি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অল্পদিন পরে ডাইজেস্টার আলোকে বিধি সংহিতাতে কিছু পরিবর্তন করা হয় এবং উপরোক্ত দু'টি গ্রন্থের ভূমিকা রূপে "ইন্‌ষ্টিটিউট্‌স্" বলে একটি পুস্তিকা রচিত হয়। জাষ্টিনিয়ান নিজে যে সব আইন জারী করেছিলেন সেগুলি তাঁর মৃত্যুর পর "কন্‌ষ্টিটিউশ্‌নিজ" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ঐগুলিকে একত্রিত ভাবে জাষ্টিনিয়ানের কোড্ বা সংহিতা বলে।

জাষ্টিনিয়ানের আইনগুলিতে প্রধানতঃ সামরিক ও অসামরিক শাসন, যাজক ও ধর্মতত্ত্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করা হ'লেও ধর্মাধিষ্ঠানের ওপর সম্রাটের আধিপত্যের কথা এতে স্পষ্ট করে বলা আছে। ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বাধীন প্রজার স্থান দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তির আইনে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এতে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিধান-সংহিতা রচনায় জাষ্টিনিয়ানের বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই কারণ এটা প্রচলিত আইনের সংকলন মাত্র। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে জাষ্টিনিয়ানের বিধান-সংহিতা আইনশাস্ত্রে রোমের সৃজনশীল প্রতিভার নিদর্শনগুলি সংরক্ষিত করেছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে আইনচর্চা বাড়ে আর এই বিধান-সংহিতা আইন সম্বন্ধীয় ধারণা গড়তে সাহায্য করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনের মধ্যে এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ পাঠঃ জাষ্টিনিয়ানের স্থাপত্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা

স্থাপত্যঃ বাইজান্টাইন শিল্পশৈলী গ্রীক, রোমান, খ্রীষ্টান ও প্রাচ্য শিল্পধারার সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এখানকার স্থাপত্য সম্পর্কে বলা হয় যে গ্রীকেরা রোমান ও খ্রীষ্টান ভাবধারাকে প্রাচ্যের ভাষায় রূপ দিয়েছিল।

এই স্থাপত্য রীতির বিকাশে জাষ্টিনিয়ানের অবদান অনেকখানি। তিনি

সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিকা হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজধানীকে সাজাবার এক পরিকল্পনা নিলেন। সিনেটের সভাগৃহ ও জেক্সিম্পাসের স্নানাগার বহুবর্ণ বিশিষ্ট মর্মর দিয়ে নির্মাণ করা হ'লো। প্রধান বাজারের পাশে প্রমোদ উদ্যান ও সুরম্য স্তম্ভশ্রেণী গড়ে তোলা হ'লো। তিনি নিজের রাজপ্রাসাদকে জাঁকজমকের চূড়ান্ত করে তৈরী করান। এর মেঝে বহুবর্ণ বিশিষ্ট পাথরের আর দেওয়ালগুলিতে ঐরকম পাথরের ওপর কাঁচ দিয়ে নানা কারুকার্য করা। বস্ফোরাসের তীরে চ্যাল্সিডনে রাণী থিওডোরার জন্য মনোরম গ্রাষ্মাবাস নির্মাণ করানো হয়।

জাষ্টিনিয়ানের অবিস্মরণীয় কীর্তি হ'লো সেন্ট্ সোফিয়ার গির্জা নির্মাণ। এন্থেমিয়াস্ ও ঈশিডোর নামে দুইজন স্থপতিকে নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা পরিকল্পনা করলেন মাঝখানে একটা গম্বুজ

সেন্ট্ সোফিয়ার গির্জা

থাকবে; তবে এই গম্বুজটি দেওয়ালের ওপর না দাঁড়িয়ে স্তম্ভশ্রেণীর ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। অথচ নীচে রোমান গির্জার মত হলঘর

থাকবে। কি করে যে এতবড় গম্বুজটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে স্তম্ভের ওপর তা' ভাবাই যায় না। ভিতরে বহুবর্ণবিশিষ্ট পাথর ও রং এর খেলা দেখবার মতো। দশ হাজার কর্মীর পাঁচ বছর দশ মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল সেন্ট্ সোফিয়া। গির্জাটির নির্মাণকল্পে সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড সোনা ব্যয় করা হয়েছিল।

জাষ্টিনিয়ান শুধু রাজধানীকেই সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন নি, রাভেনা থেকে আরমেনিয়ান সীমান্ত পর্যন্ত সুন্দর সুন্দর দুর্গ, মঠ, হাসপাতাল, গির্জা, জলাধার প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করেছিলেন। পারস্য আক্রমণে বিধ্বস্ত এন্টিওক্ নগর তিনি পুনর্গঠন করেন। রাভেনাতে তাঁর নির্মিত সান্ ভিটেলের গির্জা আজও তাঁর স্মৃতি চিহ্ন বহন করছে। সিরিয়া বা এশিয়া মাইনরের গহণ অরণ্যে বা মাটির নীচে যখনই কোন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে দেখা গেছে দু'টির মধ্যে অন্ততঃ একটি জাষ্টিনিয়ানের সময়ের।

চিত্রকলা: এই সময়ে চিত্রকলার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু চিত্রকলার অধিকাংশ নিদর্শন কালের প্রবাহে নষ্ট হয়ে গেছে। চিত্র শিল্পে এসময়ে গ্রীক প্রথাই অনুসৃত হ'তো। এই সময়ে প্রাচীরের গায়ে চিত্রাঙ্কন করা হ'তো। তাঁরা দূরত্ব ও গভীরতা চিত্রে প্রতিফলিত করতে পারতেন। জাষ্টিনিয়ানের সময়কার যিশু ও মাতা মেরীর যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে তাঁদের রাজকীয় রূপে দেখানো হয়েছে। সিল্কের কাপড়ের ওপর জীবজন্তুর চিত্র আঁকা হ'তো আর এগুলো এত সুন্দর যে জীবন্ত বলে মনে হয়। বই-এর পাতাতে নানারকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি আঁকা হ'তো যেগুলি ছিল ভারী সুন্দর।

পঞ্চম পাঠ: ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্কৃতির রক্ষকরূপে বাইজাণ্টাইনের গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র: মধ্যযুগের বাণিজ্যিক ইতিহাসে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। কৃষ্ণ-সাগরের মুখের কাছে বস্‌ফোরাস্ প্রণালীর উপকূলে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের

অবস্থান। এইস্থান থেকে নদীপথে রাশিয়ার অভ্যন্তরে গমনাগমন করা চলতো। আর এখানে ছিল প্রকাণ্ড বাজার, বিরাট বন্দর। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্পদ্রব্যের চাহিদা এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র ছিল। তাই বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ইথিওপিয়া, সিংহল, ভারত, চীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বাণিজ্য করতো। ইউরোপে ইটালী, গলদেশ, রাশিয়া প্রভৃতির সঙ্গেই এর বাণিজ্যগত সম্বন্ধ ছিল। ভূমধ্যসাগরে আরব প্রভুত্ব স্থাপিত হবার পর পূর্ব-পশ্চিমে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়। তখন ভারত ও আরব দেশের বাণিজ্যসম্ভার তার মারফত ইটালী, ভেনিস ইত্যাদি স্থানে পৌঁছাত। পশ্চিম ইউরোপ যখন কৃষিপ্রধান অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে আর বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ এখানে স্তব্ধ হয়েছে তখনও কিন্তু বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের গৌরব ম্লান হয় নি।

শিক্ষা: বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক সাহিত্য ও চিন্তাধারার বিকাশ হয়। এখানকার শিক্ষিত লোকেরা গ্রীকরচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হোমারের রচনা আবৃত্তি করতে পারা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে বিবেচিত হ'তো। এখানে অনেক পাঠাগার ছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্ববিখ্যাত।

গ্রীক ভাষাতে অনেক সাহিত্যকীর্তি রচনা করা হয়েছে। দশম শতাব্দীতে **সুইডাস** একটি অভিধান ও একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। এতে যে সব বই থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার অধিকাংশ আজ পাওয়া যায় না। তাই তাঁর রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। অপর নামকরা পণ্ডিত ছিলেন **মাইকেল সেলাস্**। তাঁর রচনাতে দর্শন, ইতিহাস, আইন, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা আছে। তিনি প্লেটোর মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সবচেয়ে নামকরা ঐতিহাসিক ছিলেন **প্রকোপিয়াস**। তাঁর "যুদ্ধের ইতিহাস" স্মরণীয় রচনা আর জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল সম্বন্ধে জানতে হ'লে তা' অপরিহার্য। তাঁর রচিত 'গুপ্ত ইতিহাস' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

বিজ্ঞান: প্রাচীন গ্রীকদের মতো বিজ্ঞানচর্চার মনোবৃত্তি বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্যে প্রকাশিত না হ'লেও চিকিৎসা শাস্ত্রে বেশ উন্নতি হয়েছিল। **ট্রেলাসের আলেকজাণ্ডার** বাত, পাগলামি, পেটের গোলমাল, আমাশয় প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর রচনা আরব, হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিতও হয়েছিল। পেটের অসুখ সৃষ্টিকারী কয়েকটি জীবাণুর নামও তিনি করেছেন। শল্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন **এজিনার পল**। তিনি টনসিল, পাথুরী প্রভৃতি রোগ অস্ত্রোপচার করে সারিয়ে দিতে পারতেন। **ফ্লবিয়াস্ ভেজেটিয়াস্** পশুদের রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বই লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সংক্রামক রোগীকে আলাদা করে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা এখানেই প্রথম হয়।

অনুশীলনী

১। (ক) কি কি সভ্যতার সংমিশ্রণে বাইজান্টাইন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?
(খ) কি কি কারণে কন্স্টান্টাইন নূতন রাজধানী গড়েছিলেন?
(গ) জাষ্টিনিয়ানের রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার কি ফল হয়েছিল?
(ঘ) বাণিজ্যের ইতিহাসে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২। টীকা লিখ: (৪ লাইন)
(ক) জাষ্টিনিয়ানের সংহিতার গুরুত্ব, (খ) সেন্ট্ সোফিয়ার গির্জা,
(গ) সুইডাস, (ঘ) ট্রেলাসের আলেকজাণ্ডার।

৩। মুখে মুখে উত্তর দাও:
(ক) প্রকোপিয়াস কী বই রচনা করেছিলেন?
(খ) জাষ্টিনিয়ানের সংহিতা কতগুলো বইকে নিয়ে বলা হয়?
(গ) ট্রীবোনিয়ান কে ছিলেন?
(ঘ) কোন্ কোন্ স্থপতি সেন্ট্ সোফিয়ার গির্জা নির্মাণ করেছিলেন?
(ঙ) পেটের অসুখের জীবাণু নিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে কে গবেষণা করেছিলেন?

পঞ্চম অধ্যায় | ইসলাম ও তার সংঘাত

প্রথম পাঠ ঃ আরব—দেশ ও জনগণ ঃ হজরত মহম্মদের জীবনী

যদি বলা হয়, কোন দেশের নাম থেকেই তার স্বরূপ বোঝা যায়, তা' হ'লে আমাদের মনে প্রথমেই আরব দেশের কথা জাগে। আরব কথার মানে 'শুষ্ক'। আরব দেশ পৃথিবীর অন্যতম শুষ্ক অঞ্চল। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর এই বৃহত্তম উপদ্বীপটি একসময়ে সাহারা মরুভূমির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

পশ্চিমাঞ্চলে লোহিত সাগরের তীরে আর মাঝের মরূদ্যানগুলোর আশেপাশে খুব অল্পসংখ্যক লোক স্থায়ী গৃহে বসবাস করতো। বণিকদের পণ্যবাহী উট চলাচলের পথের ধারে দু'একটা শহরও গজিয়ে উঠেছিল। এই রকমই নগর ছিল মক্কা আর মদিনা। দেশের অধিকাংশ লোক (১১/১২ ভাগ) ছিল বেদুইন বা যাযাবর। ব্যবসা, লুণ্ঠন ও দস্যুতা করে এরা জীবিকা অর্জন করতো। বালি, উট আর বেদুইন ছিল আরব দেশের বিশেষত্ব।

আরবেরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে রক্তপাত ও সংঘর্ষ লেগেই ছিল। কিন্তু সকলেই ছিল অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তারা অনেক দেবতার আরাধনা করতো। মক্কা ছিল তাদের প্রধান তীর্থস্থান। এখানকার কাবার মন্দিরের কালো পাথরকে তারা সবচেয়ে বড় দেবতা বলে স্বীকার করতো। এই দেবতার পূজার সময় রক্তপাত বন্ধ থাকতো। দলে দলে তীর্থযাত্রীরা এসে পূজায় যোগ দিতো। পূজার শেষে সঙ্গীত ও কবিতার প্রতিযোগিতা হ'তো।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ পবিত্র মক্কা নগরীতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (৫৭০ খ্রীঃ)। যখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর তখন তিনি খাদিজা নামে এক ধনী বণিকের বিধবার অধীনে চাকরী নেন ও পরে খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

মহম্মদ তাঁর সহযোগী আরবদের পৌত্তলিকতা সমর্থন করতেন না। তাঁর অধিকাংশ সময় গভীর মননে অতিবাহিত হ'তো। এই সময়ে স্বর্গ-দূত গ্যাব্রিয়েল তাঁর কাছে এসে ধর্মকথা শোনাতেন। একদিন তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শুনতে পেলেন। তাঁর মনে এবার দৃঢ় ধারণা হ'লো যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন দেবতা নেই। মহম্মদ সর্বপ্রথম তাঁর পত্নী খাদিজা ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ লোকের কাছে তাঁর উপলব্ধির কথা বললেন। প্রথমে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলেন পত্নী খাদিজা, আবু বক্‌র, আলী ও জৈইদ।

এবারে মহম্মদ প্রকাশ্যেই তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে লাগলেন। মক্কার কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁকে ঘৃণামিশ্রিত অবহেলার চোখে দেখতেন কিন্তু মহম্মদের শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে দেখে তাঁরা ভীত হলেন। মক্কার মত পবিত্র নগরীতে রক্তপাত নিষিদ্ধ। তাই তাঁরা অন্যান্য পন্থা যথা সামাজিক বহিষ্কার, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি অবলম্বন করলেন। মদিনার বণিকেরা মহম্মদের ওপর নির্যাতনের কথা শুনে তাঁকে মদিনায় চলে আসতে বললেন। এতে মক্কাবাসীরা ক্রোধান্ধ হয়ে মক্কার পবিত্রতা নষ্ট করে তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে লাগলেন। রাতের অন্ধকারে মহম্মদ মদিনায় পালিয়ে এলেন। মহম্মদের এই পলায়নকে হিজিরা বলে (২৪ শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীঃ)। এই সময় থেকেই মুসলমানরা তাদের সাল গণনা করে।

মদিনার অধিবাসীরা মহম্মদকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা নবধর্মে দীক্ষিত হ'লেন। তিনি ইহুদী ও বেদুইনদের পরাজিত করে তাদের দুর্গ অধিকার করে নিলেন। আবার মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো। মহম্মদ এবারে তাঁদের পরাজিত করে মক্কায় ফকিরের বেশে প্রবেশ করলেন। ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পাঠ : মহম্মদের উপদেশ : ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতির কারণ

মহম্মদের উপদেশ : মহম্মদের উপদেশ ও ধর্মানুশাসন পবিত্র কোরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সমস্ত সৎ মুসলমান বিশ্বাস করেন যে কোরাণ

ঈশ্বরের বাণী। তাই কোরাণ অভ্রান্ত ও তর্কাতীত। মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবাহত পরেই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়।

ইসলাম ধর্মের মূল কথা হ'লো ঈশ্বর বা আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্য; এবং মহম্মদ হচ্ছেন 'আল্লাহ্'র শেষ প্রেরিত পুরুষ। বিশ্বাস, উপাসনা, ভিক্ষাদান, তীর্থযাত্রা, উপবাস—এই পাঁচটিকে ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ বলা হয়। প্রত্যেক ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে এক আল্লাহ্‌তেই বিশ্বাস রাখতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানকে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করতে হবে। গরীব দুঃখীদের দান করতে হবে। রম্‌জানের সারা মাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসে থাকতে হবে। কারণ এই রমজানের মাসেই দেবদূত গ্যাব্রিয়েল মহম্মদের কাছে কোরাণ উদ্ঘাটিত করেছিলেন। প্রত্যেক ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে সারা জীবনের মধ্যে একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে হবে। মহম্মদ বলেছিলেন, প্রত্যেক মুসলমানকে ধর্ম ও ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ্) ঘোষণা করা হয় তবে কোন মুসলমান তাতে যোগদান করতে অস্বীকার করতে পারবে না।

ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতির কারণ: আজ পৃথিবীর প্রতি আট জন লোকের মধ্যে একজন মুসলমান। ইসলাম ধর্মের বিস্তার লাভের মূল কারণ হ'লো এই ধর্ম অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর এবং সহজবোধ্য। এর মধ্যে এমন কোন জিনিষ নেই যা মানুষকে জটিলতার দ্বারা বিভ্রান্ত করে। এতে বেশী অনুষ্ঠানের বাহুল্য নেই, বিধি নিষেধের কড়াকড়ি নেই। শুধু মূর্তিপূজা, জুয়া খেলা, সুদ নিয়ে টাকা ধার দেওয়া, মদ্যপান ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই ধর্ম কোন জাতির বা ব্যক্তির ধর্ম নয়। এই ধর্ম সার্বজনীন। তৃতীয়তঃ ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত গণতান্ত্রিক। এতে গরীব-বড়লোক কোন ভেদাভেদ নেই। কোন পুরোহিত তন্ত্র নেই। এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চতুর্থতঃ মহম্মদের মৃত্যুর পরে আরবেরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য

বিস্তার করেছিল এবং মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ এই ধর্মকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে।

তৃতীয় পাঠঃ খলিফা ও আরব সাম্রাজ্য

খলিফাগণঃ 'খলিফা' শব্দের অর্থ 'প্রতিনিধি' বা 'উত্তরাধিকারী'। মহম্মদ যতদিন বেঁচেছিলেন তিনি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের কাজ ছাড়াও আইন-প্রণেতা, ধর্মীয় নেতা, প্রধান বিচারক, প্রধান সেনানায়ক ও রাষ্ট্রের অসামরিক নেতার দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে (৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ) আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলি যথাক্রমে খলিফা নির্বাচিত হন। এঁরাই ইসলাম জাতির নেতৃত্ব দেন। প্রথম তিন জন খলিফা মদিনা থেকে আর আলি (চতুর্থ জন) কুফা থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মহম্মদের শিষ্য এবং তাঁর নির্দেশিত পথের পথিক। স্বধর্মে অবিচল নিষ্ঠা, পবিত্রতা, উদারতা ও সরলতা এঁদের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। ইতিহাসে এঁরা ধার্মিক খলিফা নামে পরিচিত।

মহম্মদের পর থেকেই দলাদলি ও ক্ষমতার মোহ আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। গুপ্তঘাতকের হাতে আলি প্রাণ হারান আর খলিফার পদ অধিকৃত হয় ওমিয়াদ বংশের মাবিয়ার দ্বারা। এর বংশধরেরা প্রায় নব্বই (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ) বৎসর নেতৃত্ব দেন ইসলাম জাতির। রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দামাস্কাসে। তারপর ওমিয়াদদের বিতাড়িত করে আব্বাসিদ্‌রা খলিফার পদ করায়ত্ত করেন। এঁরা বোগদাদ্ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সেলজুক বংশীয় তুর্কীদের দ্বারা আব্বাসিদ্ প্রভুত্বের অবসান হয় (১০৫৮ খ্রীঃ)। ওমিয়াদ শাসনকাল থেকেই খলিফারা হয়ে পড়েন জাগতিক শক্তি, আড়ম্বর ও বিলাসের প্রতিভূ।

আরব সাম্রাজ্যঃ পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময় অবজ্ঞাত ও অবহেলিত আরবদের অল্প সময়ে এক সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া। মহম্মদের সময়ে সমস্ত আরবেই তাঁর আধিপত্য স্থাপিত

হয় নি। আরব দেশে ইসলামের প্রভুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে সাম্রাজ্য

বিস্তারের গোড়াপত্তন করেন আবু বকর। পরবর্তী খলিফা ওমরের

সময়ে সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, সমস্ত ইউফ্রেটিজ্ উপত্যকা, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য এবং আফ্রিকার ত্রিপোলী ও মিশর আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওমিয়াদ্ আমলে মধ্য এশিয়ার খোরাসান, তুর্কীস্থান, ফারমানা প্রভৃতি অঞ্চলে ও ভারতের সিন্ধু প্রদেশে এবং পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত উত্তর উপকূল ও ইউরোপের স্পেনে আরব সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

আরবদের দ্রুত ও সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বিস্তারের পিছনে নব ধর্মের উন্মাদনা থাকলেও এর মূলে ছিল অর্থনৈতিক কারণ। আরব বেদুইনদের দুঃসহ দারিদ্র্য ও অসহনীয় অবস্থা তাদের প্রলুব্ধ করেছিল অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল জয় করতে। যে দেশ তারা জয় করতো সে দেশের অধিবাসীদের তারা তিনটের মধ্যে একটা সর্ত বেছে নিতে বলতো—কর, ইসলাম বা মৃত্যু। কর পেলে তারা আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতো না। আরব সাম্রাজ্যে অ-মুসলমানেরা কর দিয়ে ভালো ভাবেই থাকতে পারতো। তাই জেরুজালেমাদি পবিত্র স্থানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় নি।

চতুর্থ পাঠ : কর্ডোভা : ইসলামের কৃতিত্বে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া

কর্ডোভা : স্পেনের মুসলমান রাজাদের রাজাধানী ছিল কর্ডোভা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে অনুমান করা হয় যে এখানে ষাট হাজার বিরাট প্রাসাদ, দু' লক্ষ বাসগৃহ, তিন হাজার আটশত গির্জা, অগণিত মসজিদ, সাত শত স্নানাগার, অসংখ্য হোটেল, দোকান ও সরাইখানা, দরিদ্র বালকদের শিক্ষার জন্য বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় ও পাঠাগার এবং অগণিত বই এর দোকান ছিল। তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এখানেই। শুধু মুসলমানেরা নয়, দূর থেকে খ্রীষ্টানেরাও এখানে পড়তে আসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারেই চার লক্ষ পুস্তক ছিল। যখন ইউরোপের অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানতো না তখন এই নগরীর বেশীরভাগ লোকেরই অক্ষর জ্ঞান ছিল। এই নগরীর প্রধান মসজিদ (৭৮৭ খ্রীঃ) আজও পরিব্রাজকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। এখানকার পণ্ডিতেরা ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

ইসলামের কৃতিত্বে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া ঃ ইসলাম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকাতে প্রভুত্ব স্থাপন করলেও, বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের কাছ থেকে তার এশিয়াস্থ প্রদেশগুলি ছিনিয়ে নিলেও, ইউরোপে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। একমাত্র স্পেনেই তাদের সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। তারা পিরিনীজ অতিক্রম করে ফ্রান্সে অনুপ্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ফ্রাঙ্ক চার্লস্ মর্টেলের হাতে ট্যুরের যুদ্ধে (৭৩১ খ্রীঃ) পরাজিত হয়। ভূমধ্যসাগরে ইসলামের প্রভুত্ব স্থাপনের সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনে। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হ'লো। শিল্পোদ্যোগের বিকাশ স্তব্ধ হ'লো। নগরের সমৃদ্ধি নষ্ট হ'লো। এর ফলে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ কৃষি প্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়। ইসলামীয় সভ্যতা তৎকালীন ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিস, অক্স্ফোর্ড ও উত্তর ইটালীর বিদ্যালয়গুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পঞ্চম পাঠ ঃ সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় আরবের অবদান ও আরব পণ্ডিত

আরবেরা গ্রীক, পারসিক, ভারতীয়, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচীন ও সুসভ্য জাতিদের সভ্যতা থেকে উপাদান চয়ন করে যে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল তা' বিশ্ব সভ্যতার এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তারা মধ্য প্রাচ্যের লোক। তাই পূর্ব-পশ্চিম দু'টি সভ্যতার ধারাকেই তারা কাজে লাগিয়েছে।

সংস্কৃতি ঃ শিক্ষা বিস্তারে আরবদের অবদান অতুলনীয়। বোগদাদ ছিল একটা বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র। কায়রোর অল্-অজ্‌হার বিদ্যানিকেতন আর কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় আরব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কায়রোতে বারো হাজার ছাত্র পড়তো। আরব সাম্রাজ্যে বিরাট বড় বড় পাঠাগার ছিল। কতকগুলোতে একশ' হাজারের বেশী বই ছিল। প্রত্যেকটি বই তালিকাভুক্ত করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হ'তো। সাহিত্যক্ষেত্রেও আরবদের অবদান অনেক। তাদের অপূর্ব সৃষ্টি "আরব্য রজনী"। অনুবাদ করতেও তারা খুব পটু ছিল। গ্রীকপণ্ডিত এরিস্টট্‌ল ও প্লেটোর রচনাগুলি এরা অনুবাদ করেছিল। মুনাফা নামে এক সাহিত্যিক "পঞ্চতন্ত্রের" গল্প আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত অনুপম পুস্তকগুলো অনুবাদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ ছিল। মানুষের বুদ্ধির বিকাশে আরবদের সবচেয়ে স্মরণীয় দান কাগজ প্রস্তুতের কলাকৌশল শিক্ষা। চীনাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরী করতে শিখে তারা ইউরোপকে এই বিদ্যা শেখায়।

বিজ্ঞান : বিজ্ঞান-জগত আরবদের কাছে বিশেষ ঋণী। খুব সম্ভবতঃ তারাই প্রথম সংখ্যাসূচক প্রতীক ব্যবহার করে। অনেকে বলেন সংখ্যার জ্ঞান তারা ভারত থেকে আহরণ করেছিল। বীজগণিত কার্যতঃ আরবদেরই সৃষ্টি। ত্রিকোণমিতি, দৃষ্টি ও আলোক সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল। তাদের চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল অনেক উন্নত ধরনের। চিকিৎসকরা শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন। তাদের শল্যবিদ্যা ছিল যথেষ্ট উন্নত। তারা অনেক কঠিন অস্ত্রোপচার করতে পারতো। অনুভূতি বিলোপের পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল এবং রোগীকে অজ্ঞান করেই তারা অস্ত্রোপচার করতো। আব্বাসিদ্ আমলে বহু হাসপাতাল ও আরোগ্যশালা ছিল। রসায়ন শাস্ত্রেও তাদের কৃতিত্ব বিস্ময়কর। আরবরা মানমন্দির স্থাপন করেছিল এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতিও আবিষ্কার করেছিল। দোলক তাদেরই আবিষ্কার।

শিল্প : এ যুগের গৃহনির্মাণকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধনুকাকৃতি খিলান, গোল গম্বুজ ও মিনার। মসজিদ নির্মাণে তারা খুব দক্ষতা

দেখিয়েছিল। জেরুজালেমে ওমরের মসজিদ "ডোম্ অব্ দি রক্" নামে খ্যাত। এখানে অতি সুন্দর গম্বুজ আর 'মোজেক' এর কাজ দেখা-

ডোম্ অব্ দি রক্
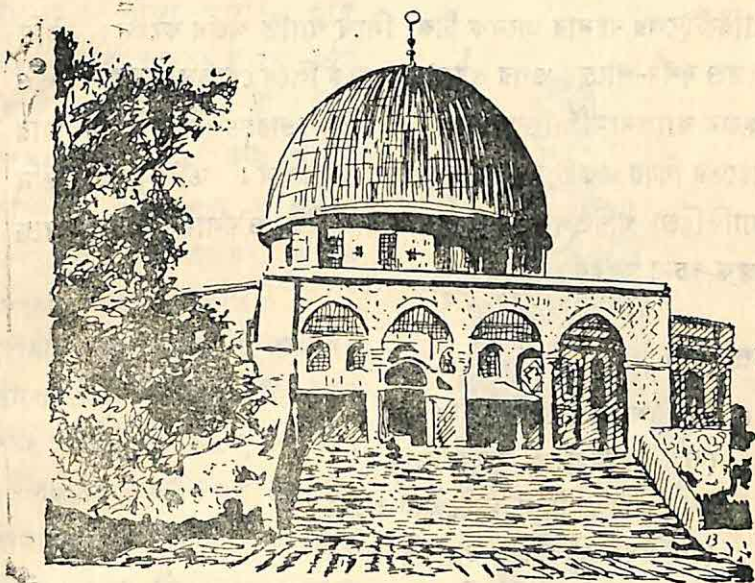
যায়। কর্ডোভার মসজিদে পাতার মত বিচিত্র জালি আর নক্শার কাজ আছে। আল্হাম্‌রা নামে গ্রানাডার রাজপ্রাসাদ কারুকার্যে ও শিল্প সৌন্দর্যে জগদ্বিখ্যাত।

পণ্ডিতঃ আরবীয় পণ্ডিতদের মধ্যে **আবুসিনা-র** নাম অগ্রগণ্য। তিনি নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে দ্বাদশ শতাব্দীতেই প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। আল্‌তবারি ছিলেন আর একজন অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি পবিত্র কোরাণের টীকা আর পৃথিবীর ইতিহাস (৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি) রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। **ইবন্‌খলদুন্** আর এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইতিহাসের ভূমিকা

নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। সবচেয়ে বড় নামকরা আরব দার্শনিক ছিলেন **ইবনরুশদ্**। তিনি অ্যারিস্টট্লের রচনার অনেক টীকা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি নিজেও দর্শন-শাস্ত্রের ওপর প্রামাণ্য পুস্তক লিখে গেছেন। **আল্‌বিরুণীও** একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন আর ভারতের বিষয় একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা' ছাড়াও তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন।

অনুশীলনী

১। (ক) আরব কথার অর্থ কী ?
   (খ) বেদুইন কাদের বলা হ'তো ?
   (গ) ধার্মিক খলিফা কাদের বলা হ'তো ?
   (ঘ) ইসলামের পাঁচটি 'স্তম্ভ' কি কি ?
   (ঙ) কর্ডোভার মসজিদ কিসের জন্য বিখ্যাত ?

২। টীকা লিখ : (দুই লাইন করে)
   আবুসিনা, ইবনরুশদ, আল্‌তবারি ও আল্‌বিরুণী।

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
   (ক) — নামে এক সাহিত্যিক —- গল্প আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।
   (খ) আরবেরা — স্থাপন করেছিল।
   (গ) জেরুজালেমে ওমরের মসজিদ — নামে খ্যাত।
   (ঘ) আরবেরা ফ্রাঙ্ক চার্লস্ মর্টেলের হাতে — যুদ্ধে (৭৩১) পরাজিত হয়।
   (ঙ) কর্ডোভার মসজিদে পাতার মত বিচিত্র — আর — কাজ আছে।

৪। ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতলাভের কারণগুলি নির্দেশ কর।

৫। যার পাশে যা বসে তাই বসাও :

ইবনখলদুন্, বেদুইন, কর্ডোভা, আবুবকর ও মুনাফা।	পঞ্চতন্ত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, আরব, ইতিহাস ও ধার্মিক খলিফা।

ষষ্ঠ অধ্যায় | মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (৮০০-১২০০ খ্রীঃ)

প্রথম পাঠ ঃ শার্লেমান—পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান

শার্লেমান ঃ রোমান সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর যে বিভিন্ন জার্মাণ উপজাতি রাজ্য স্থাপনা করে তাদের মধ্যে অন্যতম হ'লো ফ্রাঙ্ক গোষ্ঠী। রাইন নদীর তীরে ছিল এদের বসতি। এই ফ্রাঙ্ক গোষ্ঠীর শার্লেমান (৭৬৮-৮১৪ খ্রীঃ) মধ্যযুগের ইতিহাসে ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা।

শার্লেমান

রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ঃ শার্লেমানের রাজত্বের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে যুদ্ধ বিগ্রহে। ৪২ বছরের রাজত্বকালে ৫৪ বার সামরিক অভিযান করেছেন তিনি। তবে তিনি শুধু রাজ্য জয়ের নেশায় যুদ্ধ করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম ও সভ্যতার বিস্তার করা। তিনি লোম্বার্ডি, ব্যাভেরিয়া, বোহেমিয়া, স্যাক্‌সনি প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। বর্তমান ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মাণি, ইটালীর অধিকাংশ ও স্পেনের একাংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল বটে কিন্তু রোমের ধর্ম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্ট জগতের ধর্মগুরু পোপ রোমেই বসবাস করতেন। তিনি লোম্বার্ডদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে শার্লেমানের সাহায্য চাওয়ায় শার্লেমান তাঁকে রোমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের দিন শার্লেমান সেণ্ট পিটারের গির্জায় নতজানু হয়ে উপাসনা

করছিলেন। ঠিক এই সময়ে ধর্মগুরু লিও তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে

দেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন দীর্ঘ তিন শতাব্দীর পরে ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'লো। যেহেতু খ্রীষ্টধর্মের

প্রধানের আশীর্বাদে ও প্রচেষ্টায় রোমান সাম্রাজ্য ফিরে এলো তাই একে পবিত্র সাম্রাজ্য বলা হয়।

কিন্তু শার্লেমানের সাম্রাজ্য পুরানো রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়। কারণ এটা আয়তনে রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে ছোট ছিল। এটা জার্মাণদের সাম্রাজ্য। এর চরিত্র রোমান সাম্রাজ্যের থেকে আলাদা। রোম শার্লেমানের রাজধানীও ছিল না। রোমান জনসাধারণ শার্লেমানকে রাজা নির্বাচিতও করে নি। ধর্মগুরুদেরও কাউকে সম্রাট বানাবার অধিকার ছিল না। তবুও ইতিহাসে একে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বলা হয়, কারণ মানুষ চাইছিল আবার রোমান সাম্রাজ্য ইউরোপে তার সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির দিন ফিরিয়ে আনুক।

দ্বিতীয় পাঠঃ অভিষেকের গুরুত্বঃ গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ

অভিষেকের গুরুত্বঃ মধ্যযুগের ইতিহাসে শার্লেমানের অভিষেক একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জার্মাণ উপজাতিদের আগমনের সময় থেকেই রোমান সভ্যতার সঙ্গে জার্মাণ সভ্যতার মিশ্রণে এক নতুন সভ্যতার উদ্ভব হচ্ছিল। একজন জার্মাণকে রোমান সম্রাট বলে পোপের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থই হ'লো যে এই সভ্যতায় জার্মাণ ও অ-জার্মাণে আর কোন প্রভেদ রইলো না।

অভিষেকের ফলে পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার পথ প্রস্তুত হয়। জনসাধারণের মনে একটা ধারণা জন্মায় যে রাষ্ট্রশক্তি ধর্মগুরুর দান এবং পোপ ও যাজকদের স্থান রাজা বা শাসকদের ওপরে। শার্লেমানেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তিনি ভগবানের নির্বাচিত সম্রাট ঘোষিত হবার পর সামন্তরা বা আর কেউ তাঁর ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারলো না। এতদিন অবধি রোমান ধর্মগুরুরা বাইজাণ্টাইন সম্রাটকেই স্বীকার করতেন। কিন্তু শার্লেমানকে সম্রাট বলে স্বীকার করার পর বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমান গির্জার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হ'লো।

অভিষেকের মধ্যেই সাম্রাজ্য ও পোপের সংঘর্ষের বীজ লুকিয়ে ছিল। কারণ সম্রাটের ক্ষমতা কতখানি, পোপের ক্ষমতা কতটা, তাদের মধ্যে কে

বড় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর অভিষেকের ঘটনা থেকে পাওয়া যায় নি।

ধর্মাধিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ঃ শার্লেমান একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সারা জীবন ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে পোপ এবং যাজকরা সম্রাটের অধীনে থাকবেন। তিনি গির্জাকে শাসনের একটা বিভাগ বলে মনে করতেন। তিনি বিভিন্ন গির্জার যাজকদের নিযুক্ত করতেন, তাঁদের উপদেশ দিতেন এবং তাঁর শাসনে ধর্মীয় ও সাধারণ শাসনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মধ্যযুগে একটা ধারণা ছিল যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারের অধীশ্বর হচ্ছেন ধর্মগুরু পোপ ও তাঁর অধীনস্থ যাজকেরা, আর জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে প্রধান হচ্ছেন রাজা। কিন্তু শার্লেমানের গির্জা সংক্রান্ত নীতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই বিভাজন তখন ছিল না।

তৃতীয় পাঠ ঃ রাজসভা—শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

জাতিতে জার্মাণ হ'লেও রোমান সম্রাটদের মত বিখ্যাত হবার বাসনা ও প্রচেষ্টা শার্লেমানের ছিল। নিজে শিক্ষিত না হ'লেও তিনি পণ্ডিতদের সম্মান করতেন ও জ্ঞানের কদর বুঝতেন। তাই তিনি ইউরোপের নানাস্থান থেকে পণ্ডিত ও লেখক এনে তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। ব্যাকরণ পড়াবার জন্য ইটালীর পিসা নগরী থেকে **পিটার** নামে এক ব্যাকরণশাস্ত্র বিশারদকে, ইংলণ্ড থেকে বিখ্যাত পণ্ডিত **আলকুইন** এবং ইটালী থেকে **পল** নামে একজন লোম্বার্ড পণ্ডিতকেও রাজসভাতে আনান। পল লোম্বার্ডদের ইতিহাস লিখে খ্যাতিলাভ করেন। **এগিনহার্ড** শার্লেমানের জীবনী রচনা করে অমর হয়েছেন।

শার্লেমানের চেষ্টায় রাজসভাতে একটা বিদ্যালয় বসতো। সম্রাট নিজে ও তাঁর পুত্রেরা এবং অন্যান্য লোকেরা এখানে পাঠ গ্রহণ করতেন। তিনি গলদেশে **ক্লিমেণ্ট** নামে এক আইরিশ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করান।

শার্লেমান রাইন নদীর ধারে অ্যাকেনে নিজের জন্য একটা প্রাসাদ এবং গির্জা নির্মাণ করান। র্যাভেনা থেকে 'মোজেক' এনে তাঁর রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। তাঁর নির্মিত গির্জাটি আজও বর্তমান এটিকে "রোম্যানেস্‌ক্" অর্থাৎ রোমান ও গথিক যুগের মধ্যবর্তী স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বলা হয়। খিলান এবং স্তম্ভ প্রভৃতির গোলাকার গঠন এই ধরনের শিল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর নিজের জন্য একটা সুন্দর শবাধার ইটালী থেকে আনিয়ে রেখেছিলেন। তিনি নিমুইজেন ও এনজেল্‌হাইমেও সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি মিন্‌জ নদীর ওপর পাঁচশত গজ লম্বা পুল তৈরী করান।

চতুর্থ পাঠঃ মঠের জীবন—সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী

রাজধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ ও ধনীদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর এর স্বাভাবিক সরলতা নষ্ট হয় এবং জাঁকজমক ও আচার অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পায়। তখন বেশ কিছু ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁরা সংসার পরিত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান ও সাধনা করতেন। বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই সংসারত্যাগী সাধকেরা তাঁদের কুটিরগুলো পাশাপাশি নির্মাণ করে বাস করতেন। কালক্রমে একই স্থানে তাঁরা থাকতে লাগলেন। প্রার্থনা, ভোজন, ধর্মালোচনা প্রভৃতি একত্রেই অনুষ্ঠিত হ'তো। আবার বহু রাজা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সামন্ত ও সম্পন্ন গৃহস্থ পরজীবনে কল্যাণের জন্য নিজেদের অর্থ ও সম্পত্তি মঠে দান করতেন। অনেক ধর্মপ্রাণ পুরুষ ও রমণী নিজেদের সম্পত্তি দান করে জীবনটা মঠেই কাটিয়ে দিতেন। এই ভাবে সন্ন্যাসীদের মঠগুলি খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শতকেই দক্ষিণ মিশরে, তারপর এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে এই প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতি লাভ করে। যষ্ঠ শতকে মঠের সম্পত্তির পরিমাণ ও মঠবাসীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে এদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য নিয়মাবলীর প্রয়োজন হয়। মন্টি ক্যাসিনো মঠের প্রধান সাধু বেনেডিক্ট (৪৮০-৫৪৩ খ্রীঃ) মঠের জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য

বিধিনিষেধ রচনা করেন। তাঁর রচিত নিয়মগুলি এত সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী ছিল যে অল্পদিনের মধ্যেই সারা পশ্চিম ইউরোপের মঠবাসীদের জীবন প্রবাহ এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে লাগলো।
প্রত্যেক মঠে একজন করে মোহান্ত থাকতেন। তাঁকে **অ্যাবট** বা মঠাধ্যক্ষ বলা হ'তো। তিনি মঠে আবাসিকদের দ্বারা নির্বাচিত

অ্যাবট প্রায়র মঙ্ক

হতেন। তবে তিনি কারুর নির্দেশ মানতে বাধ্য ছিলেন না কিন্তু মঠের আবসিকরা তাঁর আদেশ পালন করতে বাধ্য ছিল। অ্যাবটের সহকারীকে **প্রায়র** বলা হ'তো আর তার নিচে ছিলেন সাধারণ সন্ন্যাসী বা **মঙ্ক**। সন্ন্যাসী হ'তে ইচ্ছুক লোকেদের প্রথমে শিক্ষানবীশ থাকতে হ'তো। **নান্‌** বা সন্ন্যাসিনীরা পৃথক মঠে বাস করতেন। এই মঠগুলিকে **নানারি** বলা হ'তো। মহিলা-মঠের অধ্যক্ষাকে **অ্যাবেস্‌** বলা হ'তো। প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি ছাড়া আর্তের সেবা, সেলাই ইত্যাদি করে সন্ন্যাসিনীরা জীবন কাটাতেন।
একটি কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণের চারপাশে মঠের আবাসগুলি গড়ে উঠতো। আবাসগুলির চারপাশে থাকতো আচ্ছাদিত উদ্যান-পথ। উত্তরদিকে পশ্চিমমুখী গির্জার অবস্থান। গির্জার দক্ষিণ দিকে থাকতো সাধারণ

ভোজনাগার আর তার পাশেই ধোলাই-কক্ষ। পশ্চিমদিকে ছিল
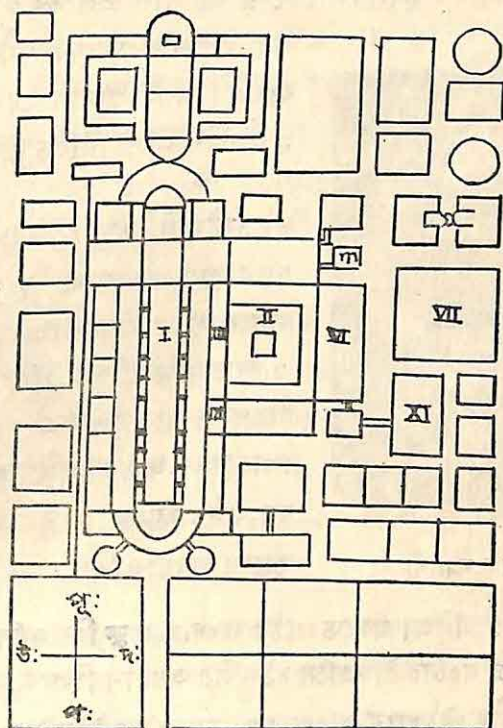
I. গির্জা, II. আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ, VI. ভোজনাগার, VII. শয্যাগৃহ
XI. অ্যাবটের গৃহ, m. ধোলাই কক্ষ।

ভাঁড়ার আর পূর্বদিকে মঠবাসীদের বহুশয্যাবিশিষ্ট বিরাট শয়ন-কক্ষ। মঠাধ্যক্ষ আলাদা একটা গৃহে থাকতেন।

মঠের আবাসিকদের নানারকম নিয়ম মেনে চলতে হ'তো। তাঁদের প্রতিজ্ঞা করতে হ'তো তাঁরা দারিদ্র্য, পবিত্রতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা পালন করবেন। কঠোর ব্রহ্মচর্যও তাঁদের পালন করতে হ'তো। তাঁরা কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখতে পারতেন না। অলসতা পাপের মধ্যেই গণ্য হ'তো। প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ, নীরব ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন ছাড়া

তাঁদের রান্না করা, মঠ পরিষ্কার রাখা, শস্যোৎপন্ন করা প্রভৃতি ছিল অবশ্য কর্তব্য। শারীরিক দুর্বল লোকেদের অনুলিপি প্রস্তুতির কাজে নিয়োগ করা হ'তো। তাঁদের পর্যাপ্ত পরিধেয় বস্ত্র ও নিদ্রার সুযোগ দেওয়া হ'তো। মাংসভক্ষণ অবশ্য নিষিদ্ধ ছিল।

ভোজনরত সন্ন্যাসী

এই মঠগুলি তাদের খরচ নিজেরাই চালাতো। নিজেদের ফুলের ও ফলের বাগান, শস্যচূর্ণনের কল, মাছের পুকুর ও শস্যের ক্ষেত্র ছিল। রোগীদের জন্য হাসপাতাল, তীর্থযাত্রী ও গরীব লোকেদের জন্য অতিথিশালা এবং বড় বড় মঠে সম্ভ্রান্ত লোকেদের থাকবার ভালো ব্যবস্থাও ছিল।

পঞ্চম পাঠ : শিক্ষা জগতে মঠের অবদান ও ক্লুনির ধর্মসংস্কার

মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে মঠগুলির অবদান ছিল অনেক। অনেক মঠ জ্ঞানচর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয় যেমন দক্ষিণ ইটালীতে ভিভারিয়াম, ফ্রান্সে সেন্ট গল্, উত্তর ইটালীতে মন্টি ক্যাসিনো ইত্যাদি। সন্ন্যাসীরা দেশের প্রয়োজনীয় সংবাদ লিখে রাখতেন। তাঁরা অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে তার অনুলিপি প্রস্তুত করাতেন। মঠগুলি না থাকলে আমরা অনেক প্রাচীন মূল্যবান পুস্তক হারাতাম। অশিক্ষিত লোকদের লেখাপড়া শেখানোকে মঠের আবাসিকরা এক পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। দ্বাদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মঠগুলি বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং সন্ন্যাসীরা বিদ্যা ও জ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলেন।

ক্লুনির সংস্কার : দশম ও একাদশ শতকের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন। ক্লুনির মঠ ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত

হয়। প্রথম থেকেই এই মঠ সামন্তদের প্রভাব মুক্ত ছিল। অল্পদিনের মধ্যে অন্যান্য মঠের ওপর এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। এঁরা দাবী করতেন যে যাজকদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। যাজকদের মধ্যে নির্বাচন করে প্রধান যাজক স্থির করতে হবে এবং গির্জার সম্পত্তি যাজকেরাই রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এককথায় এঁরা গির্জা ও মঠগুলিকে রাজা বা সামন্তদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চাইতেন দ্বিতীয়তঃ এঁরা ধর্মীয় লোকদের নৈতিক জীবনের মান উন্নত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

এঁদের প্রচারকার্যের ফলে গির্জাগুলির ওপর রোমান ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, কারণ যাজকেরা অনেক ক্ষেত্রেই রাজা বা সামন্তদের বশ্যতা স্বীকার করতেন না। তাঁরা পোপ ছাড়া অন্য কারুর কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনের ফলেই যাজকেরা অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হন এবং তাঁদের নৈতিক মান কিছুটা উন্নত হয়।

ষষ্ঠ পাঠঃ পদাভিষেক নিয়ে সংঘর্ষঃ সম্রাট বনাম পোপ

ক্লুনির মঠের সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নরপতিরা রোমের পোপ নির্বাচনে ও অন্যান্য অঞ্চলে যাজক নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতেন। রাজা বা বড় বড় সামন্তরাও যাজক নির্বাচনে ও যাজক শাসিত অঞ্চলের শাসনে হস্তক্ষেপ করতেন। রোমান পোপেরা এবারে দাবী করতে লাগলেন তাঁরা ভগবানের প্রতিনিধি আর সম্রাট বা অন্যান্য রাজারা শাসন ক্ষমতা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন।

শক্তিশালী সম্রাটেরা বলতেন যে ভগবান তাঁদের শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন আর তাঁরা একমাত্র ভগবানের কাছেই দায়ী। কাজেই পোপ বা ধর্মযাজকদের কাজ তাঁদের দেখবার অধিকার আছে। যখন সম্রাটেরা শক্তিশালী হ'তেন তখন সৈন্য সামন্ত নিয়ে রোম আক্রমণ করে পোপেদের বশ্যতা স্বীকার করাতেন। আবার পোপেরা যখন

শক্তিশালী হ'তেন তখন সম্রাট বা রাজাদের ধর্মচ্যুতি ও বহিষ্কারের ভয় দেখিয়ে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করাতেন। পোপ ধর্মচ্যুত করার মানে হচ্ছে সেই রাজার রাজত্বের সমস্ত গির্জার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে আর কোন ধর্মানুষ্ঠান হবে না। কেউ মারা গেলেও খ্রীষ্টান ধর্মানুসারে তার সৎকার হবে না। কখনও পোপেরা আবার বিধর্মী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের অস্ত্রধারণ করতেও বলতেন। একাদশ শতক থেকে প্রায় দু'শো বছর সম্রাট ও পোপের বিবাদ ইউরোপের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা ছিল। কার্যক্ষেত্রে কার প্রভুত্ব স্থাপিত হবে তা' নির্ভর করতো নরপতি ও পোপের ব্যক্তিত্বের ওপর।

সপ্তম পাঠ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কতিপয় পণ্ডিত ও ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ

দ্বাদশ শতকে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। এর আগে পর্যন্ত মঠ ও গির্জাসংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিই ইউরোপে জ্ঞানচর্চার একমাত্র স্থান ছিল। ক্রমশঃ এই রকম কতকগুলি বিদ্যালয় বড় হয়ে ওঠে। কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বা জ্ঞানী অধ্যাপকের নাম শুনে দূর দূরান্তর থেকে অনেক ছাত্র এখানে এসে পাঠ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক অবস্থা।

আস্তে আস্তে এই অবস্থার পরিবর্তন হ'লো। কোন একটা বিদ্যায়তনে হয়তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ একটা শাখা নিয়েই আলোচনা হ'তো। নানা স্থান থেকে বিদ্যার্থীরা দলে দলে কোন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অধ্যাপকের কাছে জ্ঞানলাভ করতে যেতে লাগলেন। হয়তো কয়েকজন শিক্ষক একত্র হয়ে একটা সঙ্ঘ বা সমিতি স্থাপন করলেন। এই সমিতিকে বলা হতো 'ইউনিভার্সিটাস্'। এই কথা থেকেই ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে নানা স্থান থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র ও অধ্যাপকরা আসতেন। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে ওঠে এবং তাদের প্রসার ও উন্নতি হয়। দক্ষিণ-ইটালীর **স্যালেনো** বিদ্যাপীঠ চিকিৎসা-শাস্ত্র ও উত্তর ইটালীর **বলোনা** বিদ্যাপীঠ আইন-শাস্ত্র চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। মধ্যযুগে প্যারিসের বিশ্ব-

বিদ্যালয় ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রধানতঃ **ধর্মশাস্ত্র**, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা হ'তো। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর সঙ্গে ফ্রান্সের রাজার মনোমালিন্য হওয়ায় হেন্‌রীর আদেশে ইংরাজ অধ্যাপক ও ছাত্রেরা প্যারিস পরিত্যাগ করে চলে আসেন আর **অক্সফোর্ডে** একটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অক্সফোর্ডের আদর্শে **কেমব্রিজে** একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বোহেমিয়ার **প্রাগ** শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখান থেকে বেশ কিছু অধ্যাপক ও ছাত্র চলে গিয়ে জার্মাণির **লাইপজিগ্‌**-এ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, প্রাগ্‌ ও লাইপজিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন, রোমান আইন ও খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব-চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ ছিল, ধর্মশাস্ত্র. আইন, সাহিত্য কলা ইত্যাদি। পাঠ্যবিষয় অনুযায়ী ছাত্রদের বিভিন্ন চক্রে ভাগ করা হ'তো। এক একটি ছাত্র-চক্রের নাম ছিল 'নেশ্যন'। পাঁচ বছর সাধারণ পাঠ্যসূচী অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার-শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত পড়তে হ'তো। সাধারণ পাঠ্যসূচীর পাঠ রপ্ত করলে পর ছাত্ররা ডিগ্রী পেতেন। তারপর আরও তিন বছর পড়াশোনা ক'রে পারদর্শিতা দেখালে সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক: এ যুগে অধ্যাপকদের মধ্যে **পিটার অ্যাবেলর্ড**-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অসাধারণ মনীষা ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি বলতেন, বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে যা সত্য বলে প্রমাণিত হবে তাই গ্রহণ করা উচিত। তাঁর দুই শিষ্য **আর্নলড্‌ ও পিটার লম্বার্ডি**-ও পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন **টমাস অ্যাকুইনাস্‌**। তিনি দর্শন শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। তিনি বলতেন, "ভক্তি ও বুদ্ধি ঈশ্বরের দান, সুতরাং এরা পরস্পরবিরোধী নয়।" আর এক জন অধ্যাপক **অ্যালবার্টাস্‌ ম্যাগ্‌নাস্‌** বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি সব জিনিষকে অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার করতে বলতেন।

ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ : দ্বাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাকে একটি শিল্পের শাখার মতোই দেখা হ'তো। প্রত্যেক শিল্পের জন্য যে রকম বণিকদের সমবায় সঙ্ঘ ছিল তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল শিক্ষার জন্য শিক্ষক-ছাত্রের সমবায় সঙ্ঘ। ছাত্ররা ছিল শিক্ষানবীশ আর অধ্যাপকরা ছিলেন গুরু। প্রতিটি শিল্পে যেমন শিল্পকার্য শিখতে গেলে ওস্তাদ শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করতে হ'তো, তেমনি বিদ্যাশিক্ষা করতে গেলেও ওস্তাদ শিক্ষকের সংস্পর্শ ও সাহায্য লাভ করতে হ'তো। তাই মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ও শিক্ষকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাছাড়া সে যুগে পুঁথির সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় ছাত্রদের অধ্যাপক প্রদত্ত টীকা ও বক্তৃতার উপর নির্ভর করতে হ'তো।

অষ্টম পাঠ : আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্র, সাহিত্যের বিকাশ

আইনশাস্ত্র : একাদশ শতক থেকেই ইউরোপে রোমান্ আইনের চর্চা বাড়ে। এই সময় থেকেই জাষ্টিনিয়ানের সংহিতা পাঠ ও তার ব্যাখ্যা করা আরম্ভ হয়। রোমান আইন যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ফলে ইউরোপের বিশ্বাসের যুগে ফাটল ধরে। মানুষের মন রোমান সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্র : মধ্যযুগের প্রথম দিকে ইউরোপে কোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল না। তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে বা শাক-পাতা খেয়ে লোকেরা কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসা করতো। কিন্তু একাদশ শতক থেকে গ্রীক ও আরব চিকিৎসা পদ্ধতি ইউরোপে অনুপ্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ইটালীর স্যালোনাতে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হ'তো। এখানে স্ত্রীলোকদের রোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছিল এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল—এখান থেকেই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি ইউরোপে আরম্ভ হয়। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে শব ব্যবচ্ছেদ করা ইউরোপে শুরু হয়।

ধর্মতত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্র : সারা মধ্যযুগ ধরেই ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা

হয়েছে। একাদশ শতক থেকে ধর্মতত্ত্বকে অন্ধ বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত না করে যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করব'র চেষ্টা করা হয়। যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে অ্যাল্বার্টাস ম্যাগনাস্ ক্যাথলিক ধর্মের শিক্ষাকে অ্যারিস্টটলের দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন।

সাহিত্য : এ যুগে দর্শন চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও অনেক নতুন সৃষ্টি হতে আরম্ভ ক'রলো। ল্যাটিন ভাষার সমাদর যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ল্যাটিন ছিল পণ্ডিতদের ভাষা। এ ভাষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর রচনার উপযোগী। তাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীতে এই সময় মাতৃভাষায় সাহিত্য রচিত হ'তে আরম্ভ হ'লো। এই যুগে পুরাণো জাতীয় কাহিনী নিয়ে বীর ও করুণ রসাত্মক গাথা রচিত হয়। গীতিকবিতার জন্ম হ'লো। দ্বাদশ শতাব্দী ইউরোপের মানসিকতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়ে মনের প্রসারতাবর্ধনকারী বিদ্যাসমূহের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। সর্বত্র যুক্তিবাদের দিকে ঝোঁকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

১। (ক) শার্লেমানের সাম্রাজ্যকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বলা যায় না কেন? (খ) শার্লেমানের অভিষেকের গুরুত্ব কী ছিল? (গ) অ্যাবট্ কাকে বলতো? (ঘ) ক্লুনির ধর্মসংস্কারের গুরুত্ব কি? (ঙ) দ্বাদশ শতাব্দী ইউরোপের মানসিকতার ইতিহাসে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২। টীকা লেখ : (দু' লাইনের মধ্যে)
(ক) অ্যালবার্টাস্ ম্যাগনাস্, (খ) অ্যাবেলার্ড, (গ) টমাস অ্যাকুইনাস্, (ঘ) বেনেডিক্ট, (ঙ) স্যালোনা বিদ্যাপীঠ।

৩। যার পাশে যা বসে তাই বসাও :

আইনশাস্ত্র, শার্লেমানের জীবনী, ব্যাকরণশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও লোম্বার্ডদের ইতিহাস	স্যালোনা বিদ্যাপীঠ, বলোনা বিদ্যাপীঠ, এগিনহার্ড, পিটার ও পল

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) এক একটি ছাত্র চক্রের নাম ছিল —। (খ) শিক্ষাকে একটি — মত দেখা হ'তো। (গ দ্বাদশ শতকের শেষভাগে শব — করা ইউরোপে শুরু হয়। (ঘ অক্সফোর্ডের আদর্শে — এ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (ঙ) শার্লেমান গলদেশে — নামে এক আইরিশ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করান।

সপ্তম অধ্যায় । মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

প্রথম পাঠ : সামন্ততন্ত্র : ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ

সামন্ততন্ত্র : সামন্ততন্ত্র বলতে একটা বিশেষ ধরনের সমাজ, সরকার ও অর্থনীতি সূচিত হয়। ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এর লক্ষণ দেখা গেলেও চরম বিকাশ ঘটে দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে। জমি ভোগ দখলের শর্তের ওপর এই জাতীয় সরকার, সমাজ ও অর্থনীতি নির্ভর করে। ভূ-স্বামীরা শাসনকার্য ও সরকারের দায়দায়িত্ব নির্বাহ ক'রতো। এরা রাজা বা সরকারের লোক ছিল না, সম্পূর্ণ বেসরকারী লোক। এই ব্যবস্থাতে ভূমির মালিকানার সঙ্গে শাসনক্ষমতা সংযুক্ত ছিল। এ যুগের কৃষির দ্বারাই সম্পদ উৎপাদন করা হ'তো। শিল্প গড়ে উঠেছিল কৃষি ও কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত লোকদের চাহিদা মেটাবার জন্য। যা কিছু উৎপন্ন করা হ'তো তা দিয়ে স্থানীয় ভূ-স্বামী ও কৃষকদের প্রয়োজন মেটানো হ'তো। বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হ'তো না। ভূমি ভোগদখল করবার শর্তের ওপরে সমাজে মানুষের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নির্ভর ক'রতো। যদি সে ভূমির মালিক হয় তবে সে অনেক বেশী সামাজিক সুখ-সুবিধা ভোগ করবে কিন্তু যদি সে ভূমিদাস হয় তবে তার কোন সামাজিক পদমর্যাদা থাকবে না।

ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ : দেশের সকল জমির মালিক ছিলেন রাজা। তাঁর স্থান ছিল সকলের ওপরে। তিনি তাঁর সমস্ত জমি অভিজাত সামন্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এই জমির নাম ছিল 'ফিফ্' বা তালুক। এই জমি গ্রহণ করবার সময় সামন্তদের রাজার বশ্যতা স্বীকার করতে হ'তো। তাঁরা রাজাকে প্রয়োজনের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন ও তাঁর সহায় হ'য়ে যুদ্ধ করবার প্রতিশ্রুতিও দিতেন। সামন্তরা আবার তাঁদের জমি জমিদার বা প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিতেন। শর্ত একই রকম হ'তো। এইভাবে নিম্নতম প্রজা বা কৃষক

পর্যন্ত পরস্পরের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠতো আর এই সম্বন্ধের ভিত্তি ছিল ভূমি।

অনেকে সামন্ততন্ত্রকে প্রাচীন মিশরের পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করেন। সবার ওপরে রাজা, তার নীচে অভিজাত সামন্তদের দল, তার নীচে ছোট বড় জমিদার শ্রেণী আর একেবারে তলায় ভূমিকর্ষণকারী দরিদ্র কৃষক। এই কৃষকদের মধ্যে যাদের অবস্থা একটু ভালো তাদের বলা হ'তো 'ভিলেন'। আর যারা ভূমি চাষ ক'রতো অথচ কোন অধিকার ভোগ ক'রতো না, তাদের বলা হ'তো 'সাফ' বা ভূমিদাস।

দ্বিতীয় পাঠ: সামন্তদের রক্ষাকার্য, বেসরকারী লোকদের সরকারী কাজ অধিগ্রহণ

সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন অভিজাত সামন্তরা। এঁরা বড় বড় ভূখণ্ডের মালিক ছিলেন। আইনে রাজার নীচে এঁদের স্থান হ'লেও কার্যতঃ বড় বড় সামন্তরা খুবই শক্তিশালী ছিলেন আর রাজা ছিলেন নামেমাত্র অধীশ্বর। এঁরা সুরক্ষিত প্রাসাদে বাস করতেন। এঁদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ করা।

সার্লেমানের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে নিদারুণ অরাজকতা দেখা যায়। তাঁর রাজ্যের পশ্চিমী অংশ ফ্রান্সে একটা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই রাজাদের শাসন রাজপ্রাসাদের পরিখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জার্মাণি ও ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামেমাত্র বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে জনসাধারণের দুঃখ বাড়াবার জন্য পশ্চিম ইউরোপ হ'লো তিন দিক থেকে আক্রান্ত। দক্ষিণে দুর্দান্ত মুসলমান শক্তি আঘাত হানছিল। পশ্চিম উপকূল বার বার আক্রান্ত হয়েছিল দুর্বার নর্সম্যানদের দ্বারা। পূর্ব সীমান্ত হাঙ্গেরিয়ান, স্লাভ ও তাতারদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। চরম বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অশান্তি ঘনিয়ে এসেছিল। যুদ্ধ অথবা মৃত্যু এই ছিল ইউরোপের জনসাধারণের ভবিষ্যত। এই দুর্দিনে শান্তি ফিরিয়ে এনে ইউরোপকে রক্ষা করেছিল সামন্তদের সুরক্ষিত

প্রাসাদ ও তাদের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী। এই সময়ে ইউরোপ পরিণত হয় সশস্ত্র শিবিরে।

এই সামন্তরা শুধু পেশাধারী যোদ্ধাই ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁদের প্রধান পরিচয় তাঁরা ভূখণ্ডের মালিক। তাঁরা কোন সরকারের দ্বারা নিযুক্ত শাসক ছিলেন না। কিন্তু এই বেসরকারী লোকেরা সরকারী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। তাঁরা নিজ নিজ এলাকার বিচারক ছিলেন আর তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। ওখানে যাতে কোন দস্যুবৃত্তি বা রাহাজানি না হয় সে দিকে তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একাদশ-দ্বাদশ শতকে বণিক বলতে ফেরিওয়ালাদের বোঝাতো। সামন্ত প্রভুরা দেখতেন যাতে ফেরিওয়ালারা নিরাপদে নিজেদের ব্যবসা করতে পারে। তাঁরা নিজেদের অঞ্চলের পথঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। দেশের সমস্ত খাত, বাঁধ ইত্যাদি যাতে ঠিক থাকে তার ব্যবস্থা নিতেন। তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ও প্রচেষ্টার জন্য বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হ'তো। দেশে যত রকম কল্যাণমূলক কাজ আছে তখন তা' সামন্তরাই করাতেন।

তাঁরা তাঁদের সীমানার মধ্যে অবস্থিত মঠ ও গির্জাগুলিকে সব রকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন এবং তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতেন। যদিও সামন্তরা নিজেরা লেখাপড়া জানতেন না এবং বিদ্যাচর্চাকে অপুরুষোচিত কাজ বলে মনে করতেন তবুও এঁরা মঠ বা গির্জার বিদ্যাচর্চায় হস্তক্ষেপ করতেন না। অভিজাত সামন্তরা কয়েকজন যাজককে তাঁদের ব্যক্তিগত হিসাব রাখবার জন্য নিযুক্ত করতেন। সামন্তদের হিসাব রাখা ছাড়া এঁরা বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাও লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। যুদ্ধকেই জীবনের আনন্দ বলে গ্রহণ করলেও সামন্তরা চারণ কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তৃতীয় পাঠ : সামন্ততন্ত্র একটা জীবন প্রণালী

গভীরভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো সামন্ততন্ত্র হচ্ছে

বংশানুক্রমিক অভিজাতদের জীবনপদ্ধতি। তাঁদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী সমস্ত ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। অভিজাত সামন্তরা ছিলেন ভূমির মালিক। তাঁরা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। ভূমিই ছিল তাঁদের ক্ষমতার উৎস, কিন্তু তাঁরা নিজেরা চাষবাস করতেন না। জীবিকার জন্য কোন পরিশ্রম করতেন না। অভিজাত বংশে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের দায়িত্ব ছিল সমাজকে রক্ষা করার।

এই ব্যবস্থায় সমাজের শ্রেণীবিভাগ রাজার সঙ্গে অভিজাত সামন্তদের এবং অভিজাত সামন্তদের সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধের ওপর নির্ভর ক'রতো। এই ব্যবস্থাতে মানুষ সমাজ, জাতি বা দেশের কথা ভাবতে পারতো না। প্রত্যেকেই তার ওপরের প্রভুর কথা ভাবতো। অভিজাত সম্প্রদায় আর শাসিত জনগণের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ওপরই সমাজ ছিল প্রতিষ্ঠিত।

অভিজাত সামন্তদের সুরক্ষিত দুর্গ ছিল আর তারই ছত্রছায়ায় সাধারণ মানুষেরা বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন সুরক্ষিত প্রাসাদ-দুর্গের মালিক এবং যুদ্ধ করে স্থানীয় লোকেদের সব রকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। যেহেতু তিনি রক্ষাকর্তা তাই তিনিই তাদের শাসন করতেন। যুদ্ধ তখন লেগেই থাকতো এবং তারই প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা।

সামন্তরা প্রাসাদ-দুর্গে বাস করতেন। বেশীর ভাগ দুর্গগুলো ছিল পাথরের আর উঁচু স্থানে তাদের নির্মাণ করা হ'তো। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছিল একটা ভূখণ্ড। প্রাচীরের বাইরে চওড়া খাত এবং তা সর্বদাই জলে থাকতো পরিপূর্ণ। প্রবেশ-পথে প্রকাণ্ড দরজা, পাল্লার গায়ে লোহার পাত আর মোটা মোটা পেরেক লাগানো। পরিখার ওপর চেন-লাগানো টানা সেতু। সেইটেই ছিল দুর্গে প্রবেশের একমাত্র পথ। ফটকের গায়ে ছিল ছোট্ট জানলা। এই জানলা দিয়ে প্রহরী সব সময়ে বাইরের দৃশ্য দেখতো আর নজর

রাখতো শত্রুদের গতিবিধির ওপর। শত্রু আসছে খবর পেলেই চেন লাগানো টানা সেতুটি তুলে দিতো আর রামশিঙা ফুঁকে তারা সবাইকে
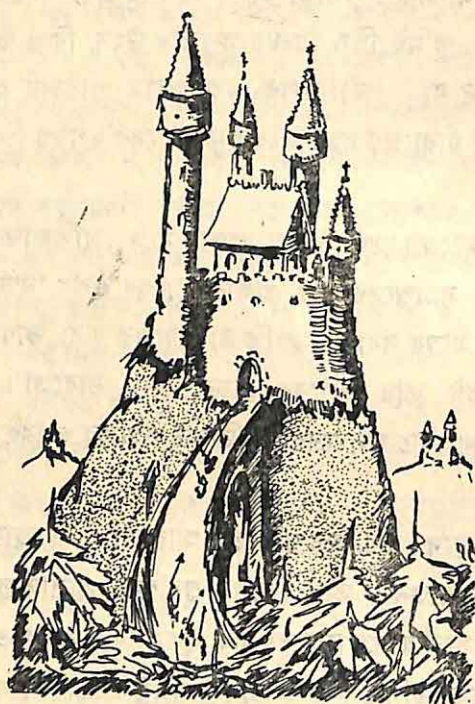
সুরক্ষিত প্রাসাদ

জানিয়ে দিতো শত্রু আসছে। অমনি সশস্ত্র যোদ্ধারা তৈরী হ'তেন যুদ্ধের জন্য।

সংগ্রাম করার জন্যই জীবন—এই ছিল সকলের দৃষ্টিভঙ্গী। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তাই অভিজাত সামন্তরা তখন যতটুকু আনন্দ এবং ভোগের আয়োজন ছিল সবটুকুই ভোগ করতেন। তাঁরা আস্ত ষাঁড় বা শূকরকে আগুনে ঝলসে ছোরা দিয়ে কেটে খেতেন। তাঁদের ভোজসভায় চারণ কবির গান, নানা রকম কসরৎ আর বাজী আনন্দবর্দ্ধন ক'রতো। সংগ্রাম এযুগের সাধারণ মানুষের জীবনেরও মূলমন্ত্র ছিল। তারা

সর্বদা সংগ্রাম ক'রতো যাতে অভিজাত যোদ্ধারা আরামে থাকতে পারেন। তারা কঠোর পরিশ্রম করে নামমাত্র উপকরণের সাহায্যে কঠিন ধরণীকে শস্যশালিনী করে তুলতো। জলাভূমি পরিষ্কার করা, বাঁধ দেওয়া, দুর্ভেদ্য বন কেটে চাষের জমি বাড়ানো, রাস্তা নির্মাণ ও প্রাণপাত করে অভিজাতদের সেবা—এই ছিল তাদের কাজ। আর অভিজাতরা তাদের পরিশ্রম লব্ধ বস্তু ভোগ করে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।

চতুর্থ পাঠ: শিভ্যাল্‌রি ও ট্রু্বেদুর

মধ্যযুগের অভিজাত সামন্তরা যোদ্ধা, শিকারী ও শাসক ছিলেন। পরে তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুলোক খ্রীষ্টধর্ম ও নারীর রক্ষা এবং আর্তের সেবার ব্রত নিয়েছিলেন। এই বীর ধর্মের পালকদের বলা হয় নাইট। নাইটদের জীবনাদর্শকে বলা হয় **শিভ্যাল্‌রি**। শিভ্যাল্‌রি কথার আদি অর্থ হচ্ছে "মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় বীরব্রতধারীদের বীরধর্ম"। কালক্রমে শিভ্যাল্‌রি বলতে একটা সামরিক সংগঠন বা সম্প্রদায়কে বোঝাতো। এদের সদস্যদের বলা হ'তো নাইট আর এঁরা গির্জা, খ্রীষ্টধর্ম এবং দুঃখীদের দুঃখমোচন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন। তাঁদের নির্দিষ্ট কোন সংগঠন ছিল না, ছিল কতকগুলি আচরণবিধি। তবে যাঁরা এই আচরণ-বিধি পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন তাঁদের এক সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করা হ'তো।

আট বছর বয়স পর্যন্ত অভিজাত সন্তান দুর্গ-প্রাসাদেই বাস করতো আর মায়ের কাছে ভদ্র ব্যবহার ও উপাসনা পদ্ধতি শিক্ষা ক'রতো। তারপর তাকে কোন অভিজাত বীর যোদ্ধার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'তো। তারা সেই বীর যোদ্ধার সঙ্গে ঘুরতো আর তখন তাদের বলা হ'তো 'পেজ' বা বালক ভৃত্য। এই বালক ভৃত্য বড় হ'লে "স্কোয়ার" হ'তো ও যুদ্ধ করতে শিক্ষালাভ করতো। লেখাপড়া তেমন কিছু শেখা তাদের হ'তো না বটে কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্রচালনা এবং দেহ ও মনের সাহস অর্জন ছিল শিক্ষার মূল বিষয়। তারপর চারিত্রিক, শারীরিক

ও মানসিক মাপকাঠিতে উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে রাজা বা কোন বড় বীর তাদের নাইট উপাধিতে বিভূষিত করতেন।

পেজ স্কোয়ার নাইট

নাইট হওয়া ছিল এক রকম বিশেষ দীক্ষার ব্যাপার। আগের দিন উপবাস করে দেহমন শুদ্ধ করতে হ'তো। তারপর নতজানু হয়ে হাতে তরবারি নিয়ে প্রার্থনা করতে হ'তো। সারারাত জেগে তাঁরা ঘরে প্রদীপ জ্বেলে সংযম অভ্যাস করতেন ও নতজানু হয়েই বসে থাকতেন। তারপর পৃষ্ঠপোষক রাজা বা কোন সম্ভ্রান্ত বীর নতজানু প্রার্থীর কাঁধে পবিত্র তরবারি ঠেকিয়ে তাঁকে 'নাইট' করতেন।

শুধু নাইট হলেই হবে না তাঁকে কতকগুলি মানবতার ব্রত নিতে এবং সেই আচরণ-বিধি মানতে হ'তো। একটি পবিত্র ধরনের জীবন যাপন করবার শপথ নিতেন নাইটরা। এই পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কয়েকটি দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করতে হ'তো। সদা সত্য কথা বলা, রাজা ও খ্রীষ্টধর্মকে মেনে চলা, নারীজাতিকে রক্ষা করা ও আর্ত লোকেদের সেবা করা এবং সর্বোপরি শত্রুর আক্রমণের সামনে কোনদিন পিছু হটে না আসা—এইগুলিই হচ্ছে নাইটের ধর্ম। সব নাইটই যে

সব অঙ্গীকার মেনে চলতো তা' মনে করার কোন কারণ নেই। বাস্তবে খুব কম নাইটই এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ ক'রতো। তবে সামনে একটা উঁচু আদর্শ থাকলে তার প্রভাব মানুষের মনে পড়তে বাধ্য। তাই শিভ্যাল্‌রির প্রভাবে মধ্যযুগের মানুষের চরিত্র মার্জিত হয়েছিল। আধুনিক যুগে ভদ্রলোকের যে আদর্শ আমাদের সামনে আছে তা' গঠনে শিভ্যাল্‌রির প্রভাব অপরিসীম।

ট্রুবেডুর ঃ একাদশ-দ্বাদশ শতকে ইউরোপ ধর্মীয় উত্তেজনায় কাঁপছিল কারণ তখন মুসলমানদের সঙ্গে চলছিল খ্রীষ্টান ইউরোপের ধর্মযুদ্ধ। ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেন্‌স্ প্রদেশে একদল গীতিকবির আবির্ভাব হয় যাঁদের কবিতায় ধর্মের নামগন্ধ নেই। এঁরা ধর্মের অনুশাসনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মানুষের মনের কথা নিয়ে গীতিময় কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা বীরত্ব ও প্রেম বিষয়ক কবিতা রচনা করতেন। নাইটদের আদর্শচ্যুতি নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতাও রচিত হয়েছিল। এই গীতিকবিদের **ট্রুবেডুর** বলা হ'তো।

এই কবিতার বিষয়বস্তু ও সুর দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে প্যারিস ও পরে ইংলণ্ডের কবিতাকে প্রভাবিত করে। ইটালী ও জার্মাণিতেও এই ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সভ্যতার ইতিহাসে দু'টি কারণে অজ্ঞাতনামা ট্রুবেডুররা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, মধ্যযুগে এই বোধহয় প্রথম সাহিত্য যা ধর্মের কথা না বলে মানুষের মনের ভাব ব্যক্ত ক'রলো। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের গোড়াপত্তন হ'লো। দ্বিতীয়তঃ, এই কবি সম্প্রদায়ের দেখাদেখি স্থানীয় ভাষায় কবিতা রচনা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এঁদের প্রভাবে সারা ইউরোপে স্থানীয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয়।

পঞ্চম পাঠ ঃ ম্যানর প্রথা ঃ সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

সামন্তরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মালিক হ'তেন। তবে তখন সব জায়গাতে কৃষিকার্য করা সম্ভব ছিল না। চাষবাসের জন্য তাঁদের জমিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হ'তো। এই অংশগুলিকে বলা হ'তো ম্যানর বা

জমিদারের তালুক। কোন কোন অভিজাত সামন্ত একাধিক তালুকের মালিক হতেন আবার কারুর কারুর একটা মাত্র তালুকই ছিল। সাধারণতঃ এক একটা তালুকে ৯০০ থেকে ২,০০০ 'একর' পর্যন্ত চাষের জমি থাকতো। প্রায় সমপরিমাণ জমিতে অবস্থিত ছিল তৃণভূমি, পশুচারণভূমি, বনভূমি ও পতিত জমি। শ্রেষ্ঠ চাষযোগ্য জমির $\frac{১}{৩}$ থেকে $\frac{১}{৬}$ অংশ হ'তো জমিদারের খাসমহল আর এর চাষ-আবাদ গ্রামের কৃষকেরা ক'রে দিতো। কৃষকদের চাষের জমি লম্বা লম্বা ফালিতে বিভক্ত করা হ'তো। এক একটি ফালি দৈর্ঘ্যে ৪০ 'রড' (৫$\frac{১}{২}$ গজে এক 'রড' হয়) ও বিস্তারে প্রায় ৪ 'রড' হ'তো। নিজের পরিবারের কাজের লোক ও বলদের সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি জমির ফালিতে চাষ করবার অধিকার কৃষকেরা পেতো। জমির ফালিগুলি মাটির চাপড়া দিয়ে চিহ্নিত করা হ'তো।

তালুকগুলো সাধারণতঃ নদীর ধারে অবস্থিত ছিল। একটা তালুকের সব জমি একত্রে থাকতো না। অনেক তালুকের জমি এখানে খানিকটা ওখানে খানিকটাও থাকতো। একটা তালুকে অট্টালিকা বলতে ছিল দু'টি—জমিদার-গৃহ আর পল্লী-যাজকের বাড়ী। আর সবই ছিল কুটির। এক একটা তালুকে ১২ বা ১৫ থেকে ৫০ বা ৬০টি কৃষক-পরিবার বাস ক'রতো। যে সব জমিদারের একাধিক তালুক ছিল তাঁরা মাঝে মাঝে তালুকে এসে কিছুদিন থাকতেন। তবে সব সময়েই তাঁদের একজন গোমস্তা এখানে বাস ক'রতো। সে জমিদার-গৃহতেই বসবাস ক'রতো। তালুকেই জমিদারের কামারশালা, রুটি সেঁকার চুল্লী, আঙুর পেষার যন্ত্র, যাঁতা ইত্যাদি ছিল। পল্লী-যাজকদের ভরণ-পোষণের জন্য জমি দেওয়া হ'তো এবং এই জমির চাষবাস গ্রামের লোকেরা করে দিতো।

তালুকে চাষের জমি তিন রকমের ছিল। এক রকমের জমিতে শরৎকালে বীজ রোপণ করা হ'তো যেমন গম ও 'রাই' শস্য। আর এক রকম ক্ষেতে বসন্তকালে বীজ রোপণ করা হ'তো যেমন বার্লি,

যব, সীম, কড়াইশুঁটি, মটর প্রভৃতি। তৃতীয় রকম ক্ষেত পতিত হয়ে প'ড়ে থাকতো। এগুলিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শস্য উৎপন্ন করা হ'তো।
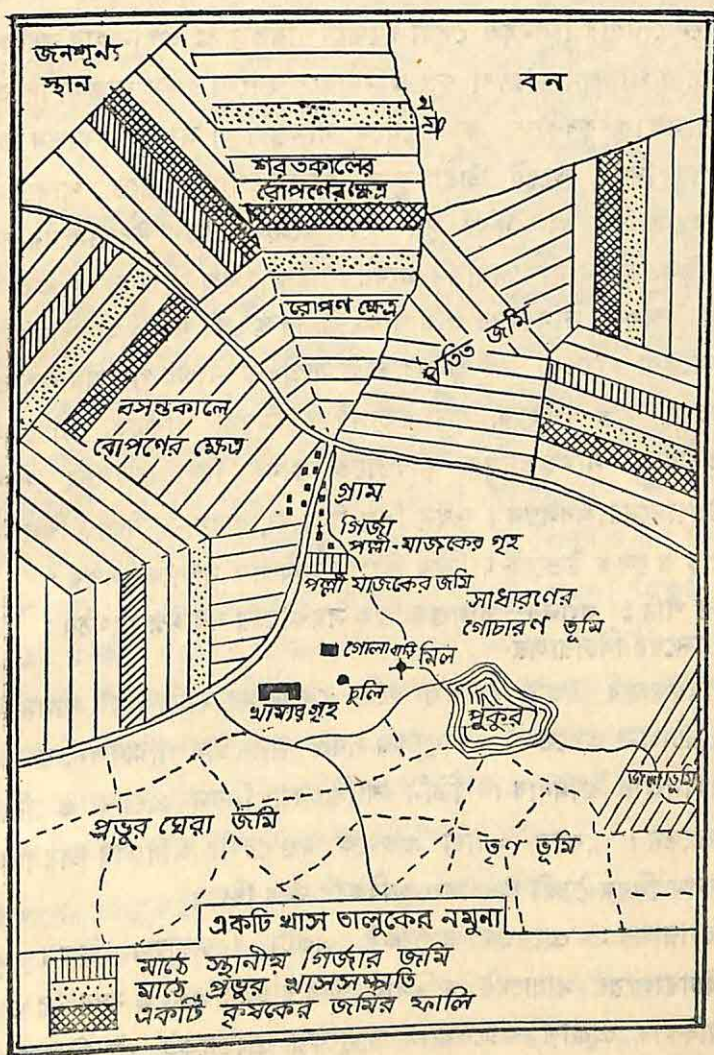
দু'বার শস্য উৎপন্ন হওয়ার পর একবার জমি পতিত ফেলে রাখা হ'তো। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তালুকগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এই অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

স্বয়ংসম্পূর্ণতা। প্রথমতঃ, তালুকগুলোতে মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিষই উৎপাদন করা হ'তো। বোধহয় লবণ ও লোহা ছাড়া এখানকার লোকেরা যা যা ব্যবহার ক'রতো সবই তারা উৎপাদন করে নিতো। গ্রামে লোহার জিনিষও তৈরী হ'তো। দ্বিতীয়তঃ, এখানকার কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রম ক'রতো এবং জমিদারকে ভালো রকম খাজনা দিতো। এখানকার কৃষকদের কাছ থেকে সামন্তরা যা আদায় করতেন তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা সুখে কালাতিপাত করতে পারতেন। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির মূল কথা হচ্ছে শাসকরা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের জীবিকার জন্য কোন কাজ করতেন না। তালুকে সামন্তদের জমি থাকতো, কিন্তু সেই জমির যাবতীয় কাজ কৃষকেরা করতো। এই অবসরভোগী সম্প্রদায় অন্যের পরিশ্রম লব্ধ ফল ভোগ করে শিকার, যুদ্ধ ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকতে পারতেন। তৃতীয়তঃ, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাতে কৃষিই ছিল একমাত্র সম্পদ উৎপাদনের অবলম্বন। তখন শিল্প ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল না। প্রভু ও কৃষক উভয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন কৃষিজাত সম্পদের ওপর।

ষষ্ঠ পাঠ : ম্যানর—সামন্ততান্ত্রিক সরকারের সর্বনিম্ন সংগঠন : ম্যানরের বিচারালয়

সামন্ততন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জমির মালিকরাই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তালুকের সমস্ত শাসনভার পরিচালনা করতেন এখানকার জমিদার। তিনি শান্তিরক্ষা, নিয়ম প্রণয়ন ও বিচার করতেন। কোন অবাধ্য প্রজাকে দণ্ড দেবার অধিকার তাঁর ছিল। কোন নিয়ম তৈরী করবারও অধিকার তাঁর ছিল।

বিচারালয় : প্রত্যেক তালুকেই একটা বিচারালয় ছিল। এই বিচারালয়ের মাধ্যমেই জমিদার তাঁর রাজনৈতিক ও সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রকাশ করতেন। তালুকের প্রত্যেকেই এই বিচারালয়ে আসতে বাধ্য ছিল। এই বিচারালয়ের বিচারক হতেন স্বয়ং জমিদার। যে সব তালুকে জমিদার থাকতেন না সেখানে জমিদারের গোমস্তা বা অন্য কোন কর্মচারী বিচার করতেন। এই বিচারালয়ের বিচার জমিদার

গৃহের একটা ঘরেই হ'তো। কখনও কখনও গির্জা বা কোন বড় বৃক্ষের নীচে এই বিচারালয়ের অধিবেশন বসতো।

তালুকের সীমানার মধ্যে অনুষ্ঠিত সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি তালুকের আদালতেই হ'তো। ইংলণ্ডের তালুকের বিচারালয়ে বড় ফৌজদারী মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হ'তো না। ইউরোপের অন্যান্য দেশে কিন্তু জমিদারের বিচারালয়ে ছোট বড় সকল প্রকার ফৌজদারী মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হ'তো। এখানে জমিদারের সম্পত্তির অধিকার ও গ্রামবাসীদের প্রথানুযায়ী অধিকার প্রয়োগ করা হ'তো। কোন্‌টি এই তালুকের রীতি তা' স্থির করবার জন্য কৃষকদেরও ডাকা হ'তো এবং তারা তাদের মতামত দিতে পারতো। যখন কোন প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করার জন্য কারুর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করা হ'তো তখন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার জন্য গ্রামবাসীদের ডাকা হ'তো এবং তাদের বক্তব্য শুনে বিচারক ক্ষতিপূরণের অঙ্ক স্থির করতেন। এখানে কোন লিখিত আইন অনুসারে বিচার করার ব্যবস্থা ছিল না। স্থানীয় প্রথা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী মামলা-মোকদ্দমার বিচার অনুষ্ঠিত হ'তো। এগুলিকে তালুকের প্রথা বলা হ'তো। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জমিজমার বিবাদ—ইত্যাদি যাবতীয় মামলার এখানে বিচার করার ব্যবস্থা ছিল। কোন ভিলেনের বা সার্ফের মৃত্যু হ'লে তার উত্তরাধিকারীকে মৃতের স্থলাভিষিক্ত এখানেই করা হ'তো। তবে এর জন্য উত্তরাধিকারীকে মাশুল দিতে হ'তো।

ইংলণ্ডের তালুকের বিচারালয়গুলির অনেক নথিপত্র পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে ইংলণ্ডের তালুকের বিচারালয়ে সাক্ষীদের বয়ান, দুই পক্ষের বক্তব্য প্রভৃতি লিখে রাখা হ'তো। এগুলি পাঠ করলে তৎকালীন সমাজ ও মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

সপ্তম পাঠ : অর্থ নৈতিক অবস্থা : কৃষকদের দেয় : সংঘবদ্ধভাবে কাম

আমরা ম্যানর প্রথা সম্বন্ধে যা বলেছি তার থেকেই বোঝা যাবে যে, গ্রামের কৃষকদের অবস্থা ভালো ছিল না। ভালো না হওয়ার মূল

কারণ হচ্ছে যে তারা জমিদারের জমি চষে দিতো এবং এর জন্য কোন পারিশ্রমিক পেতো না। জমিদারের সাংসারিক কাজও তারা বিনা পারিশ্রমিকে করতে বাধ্য ছিল আর অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তারা যা উৎপন্ন ক'রতো তাও ভোগ করতে পারতো না।

আইনতঃ কৃষকদের ওপর জমিদাররা ইচ্ছানুসারে যে কোন পরিমাণ কর ধার্য করতে পারতেন। কার্যতঃ স্থানীয় প্রথা অনুসারে তাদের কী কী পরিমাণে জিনিষ জমিদারকে দিতে হবে তা' স্থির করা হ'তো। এই দেয় দেশ থেকে দেশে, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে, এমনকি তালুক থেকে তালুকেও পৃথক ছিল।

তবে সব তালুকেই বছরে একবার মাথট বা মাথা পিছু কিছু জিনিষ জমিদারকে দিতেই হ'তো। ইংলণ্ডে কিছু পয়সা বা কয়েক পাউণ্ড মাখন বা মোম মাথট দেবার প্রথা ছিল। এই দেয়র পরিমাণ খুব বেশী ছিল না, তবে ক্রীতদাসত্বের চিহ্ন হিসাবে এই কর ছিল পীড়াদায়ক। কৃষকেরা যে পরিমাণে সম্পদ জমাতো তার ওপরও জমিদারকে একটা কর দিতে হ'তো। এর ফলে কৃষকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করেও কিছু জমাতে পারতো না। ইষ্টার (যিশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের উৎসব), বড়দিন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় জমিদারকে কিছু কিছু উপহার দেওয়ার প্রথা সর্বত্রই ছিল। যখন কোন কৃষকের মৃত্যু হ'তো আর উত্তরাধিকারী মৃতের জমি পেতো তখন তার শ্রেষ্ঠ আসবাব বা সবচেয়ে ভালো গৃহপালিত পশুটি জমিদারকে দিতে হ'তো।

এ ছাড়া জমিদারের সম্পত্তি যেমন যাঁতা, রুটি সেঁকার উনান, আঙুর পেষার যন্ত্র বা মদ্য প্রস্তুত করার যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করার জন্য কৃষকেরা মাশুল দিতে বাধ্য ছিল। আবার কোথাও কূপ, জমিদারের বলদ প্রভৃতি ব্যবহার করার জন্যও মাশুল দিতে হ'তো। চারণভূমি, তৃণভূমি, বনভূমি এমন কি পতিত জমি ব্যবহার করার জন্য তাদের কিছু করে মাশুল দিতে হ'তো। জমিদার ছাড়াও পল্লী গির্জাকে কৃষকের অনেক দেয় ছিল। তার রোজগারের $\frac{1}{10}$ ছিল গির্জার পাওনা। আবার

কেউ মারা গেলে এই কর ঠিক মত দেয়নি এই অজুহাতে আরও একটা কর দিতে হ'তো—সমাধিসংক্রান্ত কর। কৃষক মারা গেলেই তার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আসবাব বা পশু গির্জা নিয়ে নিতো। এ ছাড়া গির্জার জমি চাষ এবং অন্যান্য সমস্ত কাজ বিনা পারিশ্রমিকে কৃষকদের করতে হ'তো। এই সব মাশুল দেওয়া ছাড়া প্রত্যেক কৃষককে সপ্তাহে তিন দিন বাধ্যতামূলক শ্রম জমিদারকে দিতেই হ'তো। জমিদার তাঁর কাজের জন্য যখন খুশী ডেকে পাঠাতে পারতেন আর যে কোন কাজ দিতে পারতেন। জমিদারের আদেশ মত তারা খাটতে বাধ্য থাকতো। জঙ্গল কাটা, খাত পরিষ্কার করা প্রভৃতি তালুকের যাবতীয় কাজ তাদের করতে হ'তো। শস্য রোপণ ও কর্তনের সময় সপ্তাহে তিন দিন ছাড়াও আরো অনেক বেশী দিন অতিরিক্ত শ্রম দিতে হ'তো। এত পরিমাণে মাশুল আর শ্রম দেবার পর কৃষকদের কি অবস্থা ছিল তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

সংঘবদ্ধভাবে কৃষিকার্য: তখনকার দিনে জমির উর্বরতা খুব কম ছিল আর চাষ করবার সব উপকরণ কোন কৃষকেরই থাকতো না। লাঙ্গল গুলো অনুন্নত ছিল। বলদগুলো ছিল দুর্বল। ভোঁতা লাঙ্গল আর রোগা বলদ দিয়ে কঠিন জমি তালুকের কৃষকদের চাষ করতে হ'তো। আবার দরিদ্র কৃষক পরিবারের চাষ করার মত সামর্থ্যও ছিল না। কারুর লাঙ্গল আছে, বলদ নেই—এই ত' অবস্থা! তাই কোন কৃষক-পরিবারের পক্ষে একা জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বা ফসল কাটা সম্ভব ছিল না। কৃষকেরা সমবেতভাবে লাঙ্গল দিতো, বীজ বপন ক'রতো এবং ফসল কেটে গোলায় তুলতো।

অষ্টম পাঠ: তালুকের জীবনধারা

জমিদাররা সুখেই থাকতেন। তালুকে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন হ'তো। বেশ কিছু টাকাও সংগ্রহ করা হ'তো। যদি জমিদারের একটাই তালুক থাকতো, তবে তাঁর অবস্থা খুব ভালো হ'তো না। সেই রকম ছোট সামন্ত তালুকেই সব সময় থাকতেন এবং তালুকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু বড় বড় প্রভুদের অনেকগুলি

তালুক থাকতো। কোন কোন সামন্তর এক হাজারেরও বেশী তালুক ছিল। তাঁদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। এক জায়গায় থাকার চেয়ে তাঁরা নিজেদের সংসার নিয়ে তালুক থেকে তালুকে ঘুরে বেড়াতেন। কারণ তখনকার দিনে বিভিন্ন জায়গা থেকে জিনিষপত্র সংগ্রহ করার চেয়ে সামন্তদের তাঁদের পরিবারবর্গ ও কর্মচারীদের নিয়ে স্থানান্তরে যাওয়া অনেক সোজা ছিল। তালুকের জমিদার-গৃহগুলিতে যথেষ্ট বিলাস ও আরামের উপকরণ থাকতো। তাঁরা শূকর, হাঁস, মোরগ প্রভৃতির ঝলসানো মাংস খেতেন। খাদ্যের বিভিন্নতা না থাকলেও প্রাচুর্য যথেষ্টই ছিল।

কৃষকেরা কুটিরে বাস ক'রতো। কুটিরে ছিল বেড়ার দেওয়াল, মাটির মেঝে আর খড়-পাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদ। তাদের কুটিরগুলো ছিল পাশাপাশি অবস্থিত। কুটিরে কোন জানলা ছিল না, দেওয়ালে একটা ফাঁক থাকতো। মাটিতেই আগুন জ্বালাতো। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল ও তুষার ঘরে আসতো। তাই মেঝে থাকতো সব সময় স্যাঁতসেঁতে। রাত্রিতে তারা কোন আলো জ্বালাতো না। মোমবাতি শুধু জমিদার-গৃহ ও পল্লীযাজকের বাড়ীতেই জ্বলতো। সন্ধ্যা হ'লেই তারা ঘুমিয়ে পড়তো আর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তো। বিছানা ছিল খড় ও শুক্‌নো পাতার তোষক। তারা সব সময়েই পশমের একটা ময়লা পোষাক পরে থাকতো। ঘরে আসবাবপত্র ছিল নামমাত্র। সেই ঘরেই মুরগী, হাঁস থাকতো। লাল রং এর মোটা রুটি তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। 'রাই' নামে ঘোড়ার খাদ্যোপযোগী শস্য চূর্ণ ক'রে তার সঙ্গে গমের আটা মিশিয়ে তৈরী হ'তো তাদের রুটি। তারা শাক-সব্জীও খেতো। কখনও কখনও তাদের পচা মাছ বা মাংস জুটতো। কোন বিচারেই কৃষকদের জীবনকে সুখের বা আনন্দের বলা যায় না। নানা রকম দেয় মাশুল আর বাধ্যতামূলক কাজ এবং কঠোর পরিশ্রম তাদের পক্ষে প্রাণধারণের গ্লানি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রাখতো না। তাদের খাদ্য ছিল অপর্যাপ্ত, বাড়ী আরামবিহীন ও আনন্দহীন। তালুকের স্বাস্থ্য ছিল জঘণ্য। তাদের আমোদ-প্রমোদ বলতে ছিল

মধ্যে মধ্যে জমিদার-গৃহে ভালুকের নাচ বা বাজিকরের খেলা দেখা। তাই তারা রাত জেগে দেখতো, অবশ্য রবিবার উপাসনা ক'রবার জন্য ছুটি পেতো।

যদিও যিশু প্রচার করেছিলেন ভগবানের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান আর গরীবেরা ধনীদের চেয়ে আগে স্বর্গে যাবে, তবুও মধ্যযুগের মানুষের ধারণা ছিল যে ভগবান পৃথিবীর মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—যাজক, অভিজাত ও তুচ্ছ ব্যক্তি। এই ধারণা প্রচারিত হ'তো খ্রীষ্টান গির্জার মাধ্যমে। তুচ্ছ লোকেদের দায়িত্ব হচ্ছে যাতে অন্য দুই শ্রেণীর লোক সুখে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা। যেহেতু এই শ্রেণীবিভাগ ভগবানের করা তাই এতে কোন পরিবর্তন করা সম্ভব নয় আর সমস্ত ভালো লোকেদের উচিত এই শ্রেণীবিভাগকে মেনে নেওয়া, নাহ'লে ভগবানের নির্দেশকে অমান্য করা হবে।

অভিজাতরা আর সাধারণ কৃষকেরা একই তালুকে বাস ক'রতো। এক দল অবস্থান ক'রতো জমিদার-গৃহে আর একদল বাস ক'রতো কুঁড়ে ঘরে। তাদের সাক্ষাৎ হ'তো প্রয়োজনে কিন্তু সামাজিক কাজকর্মে দুই শ্রেণীতে কোন যোগাযোগ ছিল না। অভিজাতদের কাছে কৃষকরা ছিল অস্পৃশ্য। তারা ওদের সেবা ও কাজে সাহায্য নিতো কিন্তু 'মানুষ' বলে গণ্য ক'রতো না। সমাজের দুই মেরুতে দুই দল বাস ক'রতো।

নবম পাঠ : সার্ফদের কথা

ত্রয়োদশ শতকের আইনজ্ ঞরা সার্ফ বা ভূমিদাস ও ক্রীতদাসে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি। আইনতঃ তারা ছিল প্রভুর অস্থাবর সম্পত্তি এবং তাদের অবস্থা প্রভুর গরুভেড়ার মতোই ছিল। তাদের নিজেদের চাষের জমি ছাড়া কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। জমি হস্তান্তরিত হ'লে তারাও হস্তান্তরিত হ'তো এবং জমির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মালিকও পাল্টাতো। তারা ইচ্ছামত একটা তালুক ছেড়ে অন্য তালুকে যেতে পারতো না। যদি তারা অন্য কোন তালুকে চলে যেতো তবে তাদের জোর করে ধরে আনবার অধিকার মালিকদের ছিল। তাদের ভাগ্য তালুকের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা

ছিল। তারা প্রভুর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে বা ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে পারতো না। নিজের ইচ্ছামত ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারতো না। ছেলেমেয়েকে অন্যত্র পাঠাবার অধিকারও তাদের ছিল না। তবে প্রভুকে কিছু মাশুল দিয়ে তারা অনুমতি পেতো। প্রভু যদি ডেকে পাঠাতেন তাহ'লে সার্ফদের ছেলেকে প্রভুর কাছে হাজির করতে হ'তো।

কিন্তু কতকগুলি দিক থেকে বিচার করলে তাদের অবস্থা ক্রীতদাসের থেকে একটু ভালো ছিল। আইনে তাদের 'ব্যক্তি' বলে স্বীকার করা হ'তো। তারা আদালতে সাক্ষী দিতে এবং অন্য ভূমিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারতো। অবশ্য জমিদার বা কোন অভিজাতের বিরুদ্ধে তারা কোন অভিযোগ ক'রতে পারতো না। তাদের জমি থেকে কেউ বিতাড়িত করতে পারতো না। জমিদারের পক্ষেও তাদের জমি থেকে উংখাত করার ক্ষমতা ছিল না। তাই তাদের কোন দিনই পুরো বেকার হ'তে হ'তো না। এই নিরাপত্তা আজকের কৃষক বা চাকুরীজীবীদের নেই। আধুনিক যুগের স্বাধীন প্রজা আর প্রাচীন যুগের ক্রীতদাসের মাঝখানে সার্ফদের স্থান ছিল।

সার্ফ ছাড়া আরও দু'রকম স্বাধীন প্রজা তালুকে বাস ক'রতো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের পদমর্যাদা সার্ফদের থেকে পৃথক ছিল না। কারণ তালুকের কৃষক সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে তাদের সার্ফদের সঙ্গেই চাষ-আবাদ করতে হ'তো।

দশম পাঠ : সার্ফত্ব থেকে মুক্তির উপায়

সার্ফদের মুক্তিলাভ হচ্ছে ইউরোপীয় মধ্যযুগের ইতিহাসের শেষদিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনেকের ধারণা যে এই ঘটনায় গির্জার একটা অংশ আছে। খ্রীষ্টধর্ম নিপীড়িত মানবতার ধর্ম হ'লেও মধ্যযুগের গির্জা সার্ফদের মুক্তির জন্য কোন চেষ্টা করে নি। বড় বড় সামন্তদের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ইউরোপের গ্রামাঞ্চলে শান্তি ফিরে আসে। একাদশ শতক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে আরম্ভ করে। নগরের শ্রীবৃদ্ধি হ'তে আরম্ভ হয়। পথঘাট ও পুল নির্মিত হওয়ার জন্য যাতায়াতের সুবিধা হয়। কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ে। সার্ফরা

আপ্রাণ পরিশ্রম করে তাদের ফলন বাড়াতে ও ফসল বিক্রী করে টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সর্বত্র টাকা পয়সার প্রচলন হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জমিদাররা উপলব্ধি করেন যে সার্ফদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের মুক্তি দেওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ সার্ফদের চাইতে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যেতো কৃষি শ্রমিকদের কাছ থেকে।

এই আইনসঙ্গত উপায় ছাড়া সার্ফদের মুক্তিলাভের দু'তিনটি বে-আইনী কিন্তু কার্যকরী উপায়ও ছিল। সার্ফ প্রভুর কাছ থেকে পলায়ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতো। এখন নগরে পালিয়ে যাওয়া সোজা হ'লো কারণ নগরে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার ফলে তারা সহজেই কাজ পেয়ে যেতো। একবার নগরে এসে পৌঁছাতে পারলে প্রভুদের পক্ষে তাকে পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব ছিল কারণ নগরের লোকেরা সামন্তদের বিশেষ পাত্তা দিতো না। সার্ফরা কোন নতুন বসতিতে পালিয়েও স্বাধীনতা অর্জন ক'রতো। এই সময়ে ইউরোপের জনসংখ্যা প্রচণ্ডরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনেক বন কেটে নতুন বসতি স্থাপন করা হয় আর সীমান্তবাসী সার্ফদের সামনে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এখানে পালিয়ে সার্ফরা স্বাধীন প্রজারূপে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

সার্ফরা তাদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠলে বিদ্রোহ করার ভয় দেখাতো। সারা ইউরোপে সার্ফদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। কত অসন্তোষ যে বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে তা' আজ নির্ণয় করা খুবই কঠিন। অনেক বিদ্রোহই নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে কিন্তু তা' বলে তাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

নগরের অধিবাসীদের অনুকরণে সার্ফরা তাদের সংঘ গড়ে তোলে এবং তাদের সংঘ জমিদারদের বাধ্য করে তাদের মুক্তি দিতে। একাদশ শতকে সামরিক ও ঔপনিবেশিক অভিযানে যথা নর্সম্যানদের নিম্ন ইটালী, সিসিলি ও ইংলণ্ড বিজয় এবং তথাকথিত স্পেনীশ ক্রুসেডে

অনেক পলাতক সৈন্য যোগ দিয়েছিল। অনেক সার্ফ পালিয়ে ভাড়াটে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ ক'রলো। ভাড়াটে সৈন্যদল সামন্ততান্ত্রিক সৈন্যদলের চেয়ে বেশী কার্যকরী মনে করা হ'তো আর এই সময়ে ভাড়াটে সৈন্যদল রাখবার রেওয়াজও হয়েছিল। দলবদ্ধভাবে শান্তিপূর্ণ নিষ্ক্রমণের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'লো দ্বাদশ শতকে পূর্ব জার্মাণিতে ফ্লেমিশ উপনিবেশ স্থাপন।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হাজার হাজার সার্ফকে আকৃষ্ট করেছিল। এই সময়ে ইউরোপে এত ধর্মের উন্মাদনা ছিল যে প্রভুরা সার্ফদের এই যুদ্ধে যোগদান করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে খুব কম সার্ফই আবার তাদের পুরানো স্থানে ফিরে এসেছিল।

অনুশীলনী

১। (ক) সামন্ততন্ত্র বলতে কি বোঝায়?
 (খ) ম্যানর-গৃহের বর্ণনা দাও।
 (গ) কী কী উপায়ে সার্ফরা মুক্তি লাভ ক'রতো?

২। ভুলগুলো কেটে দাও:
 (ক) সামন্তদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ করা/বিচার করা।
 (খ) নাইটদের কতকগুলি আচরণ বিধি/ধর্মীয় অনুষ্ঠান মানতে হ'তো।
 (গ) তালুকে চাষের চার/তিন রকমের জমি ছিল।
 (ঘ) ইংলণ্ডের তালুকের বিচারালয়ে বড় বড় ফৌজদারী মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হ'তো/হ'তো না।
 (ঙ) সামাজিক কাজকর্মে অভিজাত ও কৃষকদের যোগাযোগ ছিল/ছিল না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর:—
 (ক) —— শান্তিপূর্ণ নিষ্ক্রমণের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'লো —— শতকে পূর্ব জার্মাণিতে —— উপনিবেশ স্থাপন।
 (খ) এই দুর্দিনে —— ফিরিয়ে এনে ইউরোপকে রক্ষা করেছিল সামন্তদের —— ও তাদের সশস্ত্র ——।
 (গ) একটি —— ধরনের জীবন-যাপন করবার শপথ নিতেন ——।
 (ঘ) তুচ্ছ লোকেদের দায়িত্ব হচ্ছে যাতে অন্য —— শ্রেণীর লোক —— থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
 (ঙ) তার রোজগারের —— অংশ ছিল গির্জার পাওনা।

অষ্টম অধ্যায় । ক্রুসেড

'ক্রুসেড' কথাটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ। তুর্কী মুসলমানদের কাছ থেকে খ্রীষ্টধর্মের পবিত্র স্থানগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায় ছ'শো বছর (১০৯৫-১২৯১ খ্রীঃ) ধরে খ্রীষ্টান-ইউরোপ প্রচেষ্টা চালায় এবং এই উদ্দেশে আটটি সামরিক অভিযান সংঘঠিত হয়। সামরিক অভিযান প্রেরণ এবং তার জন্য সারা ইউরোপে যে উত্তেজনা, আন্দোলন ও প্রস্তুতি হয় তাকেই ব্যাপক অর্থে আমরা ক্রুসেড বলে থাকি।

প্রথম পাঠ ঃ ক্রুসেডের প্রেরণা

মধ্যযুগের ইউরোপে যা ঘটেছে তা প্রধানতঃ ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মঠে সন্ন্যাসীর জীবন, বিদ্যাপীঠে জ্ঞানের চর্চা, গৃহ-নির্মাণকলা, সাহিত্য রচনা সবই ছিল ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। ধর্মীয় উন্মাদনার চরম প্রকাশ ক্রুসেড।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রীষ্টানেরা ধর্মের প্রেরণায় দুর্গম পথ অতিক্রম করে সুদূর জেরুজালেমে তীর্থ করতে যেতো। যিশুর জীবনের স্মৃতিজড়িত এই পূতস্থানের মৃত্তিকা স্পর্শ করা ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানদের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল। এখানে যিশুর সমাধি এবং তার পাশেই ছিল সেণ্ট্ হেলেনার গির্জা। খলিফা ওমরের আমলে জেরুজালেমের ওপর ইসলামের আধিপত্য স্থাপিত হয়। কিন্তু আরব মুসলমানেরা ধর্মীয় ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত উদার। তারা খ্রীষ্টান অধিবাসী বা তীর্থযাত্রীদের ওপর কোনরকম দুর্ব্যবহার ক'রতো না। বরং আরব মুসলমানেরা জেরুজালেমের খ্রীষ্টীয় ধর্মস্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল খ্রীষ্টানদেরই ওপর। তাই নিরুপদ্রবেই চলতে লাগলো খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের আগমন ও ধর্মানুষ্ঠান। আরব মুসলমানদের পরিবর্তে তুর্কী মুসলমানদের প্রভুত্ব ঐ অঞ্চলে স্থাপিত হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন হ'লো। আরম্ভ হ'লো খ্রীষ্টান অধিবাসী ও তীর্থযাত্রীদের ওপর নির্মম নির্যাতন। তীর্থযাত্রা হয়ে

উঠলো বিপজ্জনক। যাত্রীরা ইউরোপে ফিরে গিয়ে যখন খ্রীষ্টান ভাইদের কাছে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী শোনাতে লাগলো তখন সারা খ্রীষ্টান জগতে সৃষ্টি হ'লো অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও আন্দোলন।

কথিত আছে, পিটার নামে ফ্রান্সের একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী জেরুজালেমে তীর্থ করতে গিয়ে তুর্কী মুসলমানদের খ্রীষ্টান নির্যাতন স্বচক্ষে দেখেন। ভয়াবহ অত্যাচার দেখে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। তিনি অশ্রুসজল চক্ষে যিশুর কাছে প্রতিকার চান। স্বপ্নে যিশু তাঁকে বিধর্মীদের হাত থেকে এই পবিত্র অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে আদেশ দেন। সন্ন্যাসী পিটার ইউরোপে ফিরে এসে একথা প্রচার করা মাত্রই খ্রীষ্টান জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই আলোড়ন থেকে জন্ম হয় ধর্মযুদ্ধের। স্বপ্নে যিশু আদেশ দিয়ে থাকুন বা নাই থাকুন, এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ক্রুসেডের মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টানদের পবিত্র স্থান থেকে বিধর্মী বিতাড়ন।

কিন্তু নিছক ধর্মীয় প্রেরণা ছাড়া অন্য প্রেরণাও কাজ করেছিল এই বিরাট আন্দোলনের পিছনে। এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইটালীর কয়েকটি নগর বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। এশিয়া মাইনর ও প্যালেস্টাইনের উপকূলে তাদের কয়েকটা উপনিবেশ ছিল। অধিকৃত অঞ্চল হারাবার ভয়ে তারা তুর্কী মুসলমানদের দুঃসহ অত্যাচারের অনেক কাহিনী ইউরোপে প্রচার করেছিল। তারপর যখন সমস্ত এশিয়া মাইনর তুর্কীদের অধীনে চলে যায় তখন স্বভাবতঃই এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যকার সমস্ত বাণিজ্য-পথও তাদের অধিকারে চলে আসে। তারা খ্রীষ্টান ইউরোপের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে দিলো। এর ফলে ইউরোপীয় বণিকদের নিদারুণ অসুবিধা ও প্রচুর অর্থক্ষতি হ'তে লাগলো। কাজেই বাণিজ্য-পথ ও বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করবার প্রেরণাও এই সামরিক অভিযানগুলি সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে সাধারণ লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। রোমান আমলের পর ইউরোপের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। শিল্পের বিকাশও প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপে খাদ্যাভাব ছিল প্রচণ্ড। সামন্ততন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ কৃষকদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল কষ্টসাধ্য। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশাকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছিল দুর্ভিক্ষ। তিন বছর (১০৯৫-১০৯৭ খ্রীঃ) পশ্চিম ইউরোপে খাদ্যের ফলন একেবারে হয় নি। এই সময়ে দরিদ্র কৃষকদের ঘাস খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তিও করতে হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই পশ্চিম এশিয়া খাদ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ ও উদ্বৃত্ত ছিল। তাই বসতিস্থাপনের জন্য পশ্চিম এশিয়া ছিল আদর্শ স্থান। ধর্মগুরু দ্বিতীয় আর্বন যখন খ্রীষ্টানদের ক্লের্মেণ্টের সভায় (১০৯৫ খ্রীঃ) পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন তখন তিনি এই অঞ্চলের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তাই ইউরোপের লোকেরা অসহনীয় দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং প্রাচুর্যের দেশে বসতিস্থাপন করবার জন্যেও ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ধর্মের উন্মাদনা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের উদ্বুদ্ধ করেছিল জেরুজালেম ও পশ্চিম এশিয়া থেকে তুর্কী প্রভুত্ব বিনাশ ক'রতে। তবে সবাই ধর্মের জন্যই এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এ কথা রূঢ় সত্য যে জাগতিক ও অর্থনৈতিক প্রেরণা লুকিয়েছিল ধর্মের আড়ালে।

দ্বিতীয় পাঠঃ সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ক্রুসেডের প্রভাব

ক্রুসেড ইউরোপবাসীদের সমাজ ও জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছিল। তাই একে ইউরোপের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা হয়।

ইউরোপের সমাজের ওপর ক্রুসেডের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এর ফলে ইউরোপের নগর ও গ্রামের সাধারণ লোক সামন্ততন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং ভাঙ্গতে

আরম্ভ করে। ধর্মযুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য অনেক সামন্ত তাঁদের নগরের ওপর অধিকার বিক্রী করে দিতে বাধ্য হ'লেন। ফলে অনেক নগরের অধিবাসীরা সামন্তদের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ ক'রলো। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা অনেক সার্ফ বা ভূমিদাসকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। আবার ধর্মযুদ্ধে যোগদানের অজুহাতে অনেক সার্ফ তালুক ছেড়ে চলে যেতো, কিন্তু অভিযান শেষ হ'লে খুব অল্প লোকই ফিরে আসতো। কিছু লোক অভিযানে প্রাণ হারাতো আর অবশিষ্টরা অন্যত্র জীবিকা খুঁজে নিতো। অনেক নগর প্রতিষ্ঠা ও শিল্পের বিকাশ হওয়ার ফলে সেই সব স্থানে নিযুক্ত হয়ে তারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ ক'রতো। এক কথায় বলতে গেলে ধর্মযুদ্ধ সমাজে মুক্ত পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। তাই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে আধুনিক মুক্ত সমাজ স্থাপনের পথে ধর্মযুদ্ধকে একটা বিরাট পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যায়।

ধর্মযুদ্ধের ফলে সমাজে নারীর অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পুরুষরা দূর দেশে যুদ্ধযাত্রা করার ফলে দেশের কাজ-কারবার দেখার দায়দায়িত্ব মহিলাদের ওপর বর্তায়। মহিলারা এখন সম্পত্তি দেখাশোনা ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে আরম্ভ করলেন। এই দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ফলে সমাজে তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি পেলো।

ধর্মযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পশ্চিমের দেশগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রাচ্যের অনেক বিলাস ও আরামের উপকরণ থেকে বঞ্চিত ছিল। ক্রুসেডের পরে প্রাচ্যের প্রভাবে পাশ্চাত্য জীবনে অনেক নতুন নতুন জিনিষের প্রচলন হ'লো যথা পালঙ্ক, হাতলওয়ালা গদি-আঁটা চেয়ার, জাজিম, গদি, তোষক, কাঁচের বাসন, জার ইত্যাদি। চিনি, তিল, ময়দা, চাল, লেবু, তরমুজ, খুবানি, গন্ধযুক্ত পেঁয়াজ প্রভৃতিও ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ হ'লো। আয়না, চন্দন কাঠ, নীল, সুগন্ধি দ্রব্য, মশলা, লবঙ্গ প্রভৃতি

জিনিষের প্রচলনও আরম্ভ হয়। প্রাচ্যের মসলিন ইত্যাদি কাপড় এবং প্রাচ্যের পোষাকের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয় হয়। প্রাচ্যের দেখাদেখি পাশ্চাত্যের লোকেরাও মন্ত্রপূত কবচ, তাবিজ, জপমালা প্রভৃতি ব্যবহার করতে লাগলো। প্রাচ্যের খাদ্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় ঘটে এবং প্রাচ্যের অনুকরণে তারা সেই রকম খাদ্য প্রস্তুত ও জিনিষ উৎপন্ন করতে আরম্ভ করে। বলা হয়, ক্রুসেডের সংস্পর্শে এসে ইউরোপের জীবন ধারায় আমূল পরিবর্তন হয় এবং তা' হয়ে ওঠে মার্জিত ও বিলাসী।

সংস্কৃতি ঃ ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের লোকেরা নতুন জলবায়ু, প্রাকৃতিক বস্তু, রীতি-নীতি এবং আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হ'লো। নতুন পরিবেশের সংস্পর্শে তাদের মনের বদ্ধ দুয়ার খুলে গেলো। শতাব্দীর সংস্কার ও ধ্যানধারণা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হ'লো। ইউ-রোপীয়দের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পেলো, উদারতা বাড়লো এবং অনেক প্রাচীন কুসংস্কার ও প্রথা ধ্বংস হয়ে গেলো। আগে ইউরোপের লোকেদের মুসলমান সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব ছিল কিন্তু মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে সে ভাব কেটে গেলো। পশ্চিম ইউরোপের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পেলো—ভূমধ্যসাগর, এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অনেক গভীর হ'লো। নতুন দেশ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ বাড়লো। আরম্ভ হ'লো নতুন নতুন স্থানে ভ্রমণ করবার আগ্রহ। প্রাচ্যের প্রভাবে পাশ্চাত্যের চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, গণিত, বিজ্ঞান, হিসাবরক্ষার বিধি প্রভৃতি এবং ইউরোপের সাহিত্যও যথেষ্ট লাভবান হয়। প্রাচ্যের অনেক কাহিনী ইউরোপের সাহিত্যে স্থান পায়। এমন কি সেক্সপীয়র ও মার্লোর লেখায় ধর্ম-যুদ্ধের সময়কার অনেক বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে। যুদ্ধবিদ্যায় প্রাচ্যের অনুকরণে অবরোধ এবং দুর্গস্থাপন ইউরোপে হ'তে আরম্ভ হয়। গৃহ-নির্মাণকলাতেও প্রাচ্যের প্রভাব দেখা যায়। জেরুজালেমের গির্জার অনুকরণে লণ্ডন ও কেমব্রিজে গির্জা নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচ্যের প্রভাব পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ওপর পড়তে আরম্ভ করেছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং সিসিলি ও স্পেনের মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে। তবে এই রূপান্তর অত্যন্ত ধীরে ধীরে হচ্ছিল এবং ক্রুসেড এই রূপান্তরের গতিকে বাড়িয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিলো।

তৃতীয় পাঠ : অর্থ নৈতিক প্রভাব

ক্রুসেডের ফলে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ধ্বংস হ'তে আরম্ভ করে। এই অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছিল নগরের উত্থান। আর ইটালীর নগরগুলির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল ক্রুসেডের ফলে। ইটালীর নগরগুলি, বিশেষ করে ভিনিস্, জেনোয়া, পিসা ও এম্যাল্‌ফি প্রভৃতি নগরগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়। ধর্মযোদ্ধারা এই সব নগর থেকে জাহাজে করে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ করতে যেতেন। তাই জাহাজ ব্যবসার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে টাকার ব্যবহার ছিল না বললেই হয়। পশ্চিম ইউরোপে জিনিষ বা পরিশ্রমের বিনিময়ে বেচা-কেনা হ'তো। কিন্তু কৃষি-জীবনের এই অর্থনীতিকে ক্রুসেড পরিবর্তিত করে। ইউরোপের একজন সামন্তকে যুদ্ধে যোগদান করতে হ'লে হাজার মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করতে হ'তো, পথের খরচার জন্য তাঁকে টাকা ব্যবহার করতেই হ'তো। হোটেলের খরচ, জাহাজের ভাড়া ও রাহা খরচ তাঁকে নগদ মূল্যেই মেটাতে হ'তো। দ্বাদশ শতকে নগদ টাকা একমাত্র নগরের অধিবাসীদের হাতেই ছিল। তাই ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী সামন্তরা নগরের অধিবাসীদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন ও বিনিময়ে তাঁরা অনেক সুবিধা আদায় করে নিতেন। ক্রুসেডের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে নগরের সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায়। ক্রুসেডের পর থেকেই দক্ষিণ ইটালীর নগরগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

যেহেতু ক্রুসেডের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় সেইজন্য

স্বাভাবিক নিয়মেই জিনিসের উৎপাদনও বাড়াতে হয়। এতদিন ইউরোপে কুটিরশিল্প ছিল কৃষির একটা অঙ্গ। তখন উৎপাদন করা হ'তো স্থানীয় লোকেদের চাহিদা মেটাবার জন্য। শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রী করার কোন বাজার ছিল না। এখন জিনিষের চাহিদা বাড়লো, কারণ জিনিষ কেনবার লোক বেড়েছে আর তার জন্য জিনিষ বিক্রী করবার বাজারেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিক্রীর উদ্দেশে জিনিষ তৈরী হ'তে লাগলো। সেজন্য কুটিরশিল্প আর কৃষির অঙ্গ হিসাবে রইলো না। তা' সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে গেলো এবং নগরে বা গ্রামে নিজের প্রয়োজনেই কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা হতে লাগলো। শিল্পের ওপর জমিদার বা সামন্তপ্রভুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হ'লো এবং কুটির-শিল্পগুলি বণিক-সংঘের নিয়ন্ত্রণে চলে এলো। কৃষি থেকে কুটির-শিল্পের পৃথকীকরণের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। (ক) 'ক্রুসেড' কাদের মধ্যে হয়েছিল?

(খ) খ্রীষ্টানরা কেন জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে চাইতেন?

(গ) সন্ন্যাসী পিটার কোথাকার লোক ছিলেন? তিনি কী স্বপ্ন দেখেছিলেন?

(ঘ) ক্রুসেডের পিছনে কী কী জাগতিক প্রেরণা ছিল?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) ধর্মগুরু —— খ্রীষ্টানদের —— সভায় (১০৯৫ খ্রী:) পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

খ) তাই — সমাজ থেকে আধুনিক — সমাজ স্থাপনের পথে — একটা বিরাট পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা হয়।

(গ) ধর্মযুদ্ধের ফলে সমাজে — অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

(ঘ) — ও — লেখায় ধর্মযুদ্ধের সময়কার অনেক — স্থান পেয়েছে।

(ঙ) তাই — ব্যবসার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

৩। ভুলগুলো কেটে দাও:

(ক) কুটিরশিল্প আর কৃষির অঙ্গ হিসাবে রইলো/রইলো না।

(খ) ক্রুসেডের ফলে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ধ্বংস হয়/রক্ষা পায়।

(গ) মধ্যযুগীর ইউরোপে টাকার ব্যবহার ছিল/ছিল না বললেই চলে।

(ঘ) ক্রুসেডের পর থেকেই দক্ষিণ ইটালীর নগরগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়/কমে।

(ঙ) ক্রুসেডের ফলে ইউরোপে অনেক আরামের উপকরণ প্রবর্তিত হয়েছিল/হয়নি।

নবম অধ্যায় | মধ্যযুগের নগর

প্রথম পাঠ ঃ নগরের শ্রীবৃদ্ধি ঃ ক্রুসেডের প্রভাব ঃ রাজকীয় সনদে নগরের স্বায়ত্ত শাসন

সব যুগেই নগরগুলি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পাঁচ ছয়শো বছর ইউরোপের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগরের অনুপস্থিতি। দশম-একাদশ শতক থেকে আবার নগর গড়ে উঠতে আরম্ভ করে।

বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন সময়ে নগরের বিকাশ হয়েছে। হূণ ও নর্সম্যান আক্রমণের সময় বহুলোক দেওয়ালের আবেষ্টনীর মধ্যে বসবাস করে এবং তার থেকে বেশ কয়েকটি নগরের সূচনা হয়েছে। কয়েকটি নগর গড়ে উঠেছিল অভিজাতদের প্রাসাদ ও সন্ন্যাসীদের মঠকে কেন্দ্র করে। কতকগুলির উৎপত্তি হয় বাজারকে কেন্দ্র করে। আবার নাব্য নদীর উপকূলেও বা পথের চৌমাথাতেও নগরের সৃষ্টি হয়েছে।

তবে দ্বাদশ শতক থেকে নগরের সংখ্যা, আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হ'লো ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি। ইটালীতেই নগরের বিকাশ সবচেয়ে বেশী হয় কারণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে এরা অংশ গ্রহণ করতে পারতো।

ধর্মযুদ্ধ নগরের ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ধর্মযুদ্ধের সময় সামন্তদের নগদ টাকার প্রয়োজন হ'তো। তখনকার দিনে একমাত্র নগরবাসী সওদাগরদের হাতেই নগদ টাকা থাকতো। সামন্তরা যখনই নগরবাসীদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন তখনই নগরবাসীরা কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতো। তার ফলে নগরবাসীদের সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা বাড়ে। আবার ক্রুসেডের সময়ে বাণিজ্যের বিস্তারও ঘটে। আর বাণিজ্যের বিস্তার হ'লেই উৎপাদন এবং বাজারের উন্নতি হতে বাধ্য। বাণিজ্য

যেমনই বাড়তে লাগলো নগরগুলো তাদের স্বায়ত্বশাসন অর্জন করার মতো অর্থসঞ্চয় করতে সমর্থ হ'লো।

মধ্যযুগীয় নগরগুলি কোন সামন্ত বা রাজার খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংলণ্ডের বেশীর ভাগ নগর রাজার খাস তালুকের অধীনেই ছিল। এইজন্য নগরের প্রভু ছিলেন রাজা। রাজার অর্থের প্রয়োজন সব সময়েই থাকতো আর যুদ্ধের সময় এই প্রয়োজন খুব তীব্র হ'তো। রাজাদের যুদ্ধ ত' লেগেই ছিল। রাজাকে অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে নগরের ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ কর ধার্য করা, শাসন করা প্রভৃতির অধিকার ছেড়ে দিতে হ'তো। রাজা এর জন্য টাকা নিতেন। ইংলণ্ডের অনেক নগর **দ্বিতীয় হেনরী** বা **প্রথম রিচার্ডের** আমলে শাসনের অধিকার কিনে নেয়। রাজা জনের আমলে ইংলণ্ডের এত নগর স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার কিনে নেয় যে তাঁকে সনন্দ-ব্যবসায়ী বলা হ'তো অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে নগরের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার বিক্রি করাই ছিল তাঁর কাজ।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ নগর জীবন ঃ বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তি

মধ্যযুগের শহরগুলো প্রথমে বেশ ছোটই ছিল, কিন্তু এখানে অনেক লোক ঘেঁষাঘেঁষি করে অল্প জায়গাতে বসবাস করতো। পথগুলি ছিল সরু, তবে পাথর দিয়ে বাঁধানো। রাস্তাগুলো অনেক সময়ে আবর্জনাপূর্ণ এবং নোংরা থাকতো। পথে কুকুর আর শূকর ঘুরে বেড়াতো। কখনও কখনও অনেক মজার ব্যাপার হ'তো। রাস্তা দিয়ে পথিক যাচ্ছে আর তার মাথায় গৃহস্থ জানলা দিয়ে ময়লা জল ঢেলে দিলো। বেশীর ভাগ বাড়ী ছিল কাঠের। আগুন লাগার সম্ভাবনাও তাই ছিল। আবার শহরে জলেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক নগর স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার কিনে নেবার পর তাদের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। পাকা বাড়ী তৈরী হ'তে আরম্ভ হয়। নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত একজন মেয়র কয়েকজন

সহকারী নিয়ে শাসন করতে আরম্ভ করেন। প্রতি শহরেই গির্জা, বাজার আর টাউন-হল থাকতো। অনেক শহরে বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত
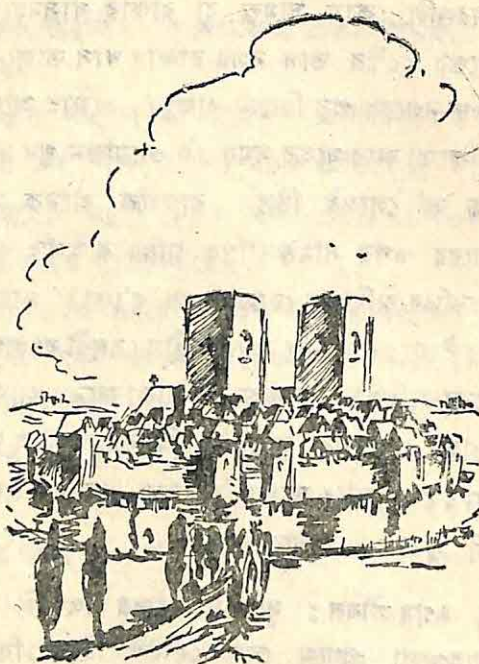
মধ্যযুগের নগর

হয়। ছুটির দিনে বা কাজ না থাকলে নগরবাসীরা বাজারেই সমবেত হ'তো। দোকানপাট অনেক ছিল। তবে দোকানের জিনিষপত্র খুব ভালো করে সাজিয়ে রাখা হ'তো না। দরজার সামনে একটা কাঠের ফলক ঝুলিয়ে রাখা হ'তো, তাতে যে জিনিষের দোকান তার ছবি আঁকা থাকতো। এক একটি দোকানে এক এক ধরনের জিনিষ পাওয়া যেতো। প্রথম দিকে ব্যবসায়ীদের অবস্থা ভালো ছিল না কিন্তু দ্বাদশ শতক থেকে এঁরা বিত্তশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হন। তাঁরা তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁরা নগরগুলিকে সভ্যতার পীঠস্থান করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন।

বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তিঃ নগরের উত্থানের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য অভিজাতদের নির্মিত দুর্গ বা প্রাসাদগুলি। এগুলিকে সংরক্ষিত স্থান বা 'বুর্গ' বলা হ'তো। নর্সম্যান, ম্যাগিয়ার, শ্লাভ্ ও মুসলমান আক্রমণের সময় স্যাক্সনি ও পূর্ব জার্মাণ সীমানায় এবং ডেন আক্রমণের সময় ইংলণ্ডে অনেক 'বুর্গ' গড়ে ওঠে। সামরিক প্রয়োজনে গড়ে উঠলেও বুর্গগুলো পরে শাসনের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে জিনিষ বিক্রী করতে ফেরিওয়ালারা আসতো। পরে বেচা-কেনা বাড়লে দেওয়ালের বাইরে অর্থাৎ 'ফ-বুর্গে' বণিক, ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বাস ক'রতো। তখন নতুন গড়ে ওঠা শহরতলীকেও দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হ'লো। এখানে যে সব লোক বাস করতো তারা জীবিকার জন্য কোন ভাবেই জমির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। রুটি প্রস্তুত করা, বস্ত্র বয়ন করা বা কোন জিনিষ বিক্রী করা ইত্যাদি এদের কাজ ছিল। এখানকার অধিবাসীদের চারিত্রিক বিশেষত্বের জন্য তাদের একটা নতুন নামে অভিহিত করা হ'লো—"বারজিস্" বা "বারগার"। ল্যাটিন ভাষায় এর নাম ছিল "বারজেন্সেস্"। এর থেকেই বুর্জোয়া শব্দের সৃষ্টি হয় যার অর্থ হচ্ছে তৃতীয় স্তরের লোক বা মধ্যবিত্ত।

তৃতীয় পাঠঃ গিল্ড্

মধ্যযুগের নগরগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গিল্ড্ বা সংঘ। সাধারণতঃ নগরগুলিতে দু'রকম গিল্ড্ ছিল—বণিকদের ও কারিগরদের। প্রত্যেক কারিগরি শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক গিল্ড্ বা সংঘ গড়ে ওঠে। ছুতার, কামার, স্যাকরা, কসাই, ধোপা, রাজমিস্ত্রী সকলেরই আলাদা গিল্ড্ বা সংঘ ছিল। কারিগরদের গিল্ড্ গুলো অনেক ভালো কাজ ক'রতো। কোন কারিগর মারা গেলে বা অসুস্থ হ'লে তার পরিবারবর্গকে গিল্ডের টাকা থেকে অনুদান দেওয়া হ'তো। বিদ্যালয় বা গির্জা নির্মাণ করবার সময় এর থেকে চাঁদা

দেওয়া হ'তো। প্রতি গিল্ড্-এর নিজস্ব আইন-কানুন ছিল। কাজের সময়, বেতন ও কি ধরনের জিনিষ তৈরী করতে হবে তাও গিল্ড্ স্থির করে দিতো। অসাধু উপায়ে ব্যবসা করা চলতো না। জিনিষের দাম বাঁধা থাকতো। অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেওয়া হ'তো।

কারিগরি গিল্ড্গুলোতে তিন শ্রেণীর লোক থাকতো—ওস্তাদ, কারিগর ও শিক্ষানবীশ। শিক্ষগ্রহণ না করে কেউ কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতো না। প্রথমে শিক্ষানবিশী করতে হ'তো। এই সময় ওস্তাদের কাছে তারা কাজ শিখতো। বেশীর ভাগ কাজে শিক্ষা-প্রাপ্তির সময় ছিল তিন বছর, কিন্তু সোনা-রূপার কাজে দশ বছর। শিক্ষানবীশরা কোন বেতন পেতো না। ওস্তাদের বাড়ীতে থেকে এবং তাঁর কাছেই খাওয়া-দাওয়া করে কাজ শিখতো। তারা দোকানের মালও বেচতো। তারপর শেখার কাজ শেষ হ'লে তারা হ'তো কারিগর। তারা কোন ওস্তাদের কাছেই কাজ করতো, বেতন পেতো, কিন্তু নিজেরা কোন কারিগরী প্রতিষ্ঠানের মালিক হ'তে পারতো না। এই কাজে পারদর্শিতা দেখালে নিজেদের কাজের নমুনা দেখিয়ে পরীক্ষা দিতে হ'তো। নমুনা ভালো হ'লে তারা ওস্তাদ হ'তো এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়তে পারতো।

ব্যবসায়ীদের সংঘগুলি খাদ্যদ্রব্য ছাড়া নগরের সমস্ত বেচা-কেনা নিয়ন্ত্রণ করতো। তারা বে-আইনী ব্যবসা প্রতিরোধ করতো, যেমন বেশী দামে বিক্রী করবে বলে বাজারের সব কিনে নেওয়া বা জিনিষের দাম বাড়বে বলে সেই জিনিষ বাজার থেকে সরিয়ে ফেলা ইত্যাদি। তারাও অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন ক'রতো, যেমন ক্ষতিগ্রস্ত বা দরিদ্র ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা, নগরের উন্নতিকল্পে দান করা, নগরের শাসনে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

কারিগর ও ব্যবসায়ীদের গিল্ড্-এর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। একটির সদস্য অপরটির সদস্য হ'তে পারতো। দু'ধরনের গিল্ড্-এর মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা বা ঈর্ষার ভাব ছিল না। নগরের ব্যবসায়ী,

বণিক ও শিল্পীরা যৌথজীবন যাপন করতেন বলে সংঘবদ্ধ নগরগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে তারা নগরের শাসনভার অর্জন করে। মধ্যযুগের যে সব নগর সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল তাদের মধ্যে **ভিনিস, জেনোয়া, কোলোন, অ্যামাল্‌ফি, অ্যাণ্ট্‌ওয়ার্প** প্রভৃতির নাম বিশেষ বিখ্যাত। নগরে গিল্‌ড্‌-এর হল থাকতো সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী ও সংঘ একত্র মিলিত হয়ে নগরসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো। এইগুলোই টাউন-হল বা নগরের সভাগৃহে পরে রূপান্তরিত হয়। নগরের অধিবাসীদের ঐশ্বর্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং এরা স্বাধীন রাষ্ট্রের মতই শাসনব্যবস্থা চালাতে আরম্ভ করে।

অনুশীলনী

১। পাঁচ লাইনে উত্তর লেখ :

(ক) ক্রুসেডের ফলে নগরগুলির কেন শ্রীবৃদ্ধি হয় ?

(খ) বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তি কী করে হয় ?

(গ) গিল্‌ড্‌ কাকে বলে ? কারিগরেরা কী ভাবে থাকতো ?

(ঘ) রাজকীয় সনন্দে নগরগুলো কী ভাবে অধিকার পেতো ?

২। (ক) মধ্যযুগের ইউরোপের চারটি নগরের নাম কর।

(খ) ইংলণ্ডের রাজা জন্‌কে সনন্দ-ব্যবসায়ী কেন বলা হ'তো ?

(গ) কারিগর ও ব্যবসায়ীদের গিল্‌ডের মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল কি ?

(ঘ) টাউন-হল কাকে বলতো ?

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) তবে দ্বাদশ শতক থেকে নগরের — ও — মূল কারণ হ'লো — বৃদ্ধি।

(খ) বেশীর ভাগ কাজে শিক্ষাপ্রাপ্তির সময় ছিল — বছর, কিন্তু — কাজে — বছর।

(গ) — উপায়ে ব্যবসা করা চলতো না।

(ঘ) ব্যবসায়ীদের সংঘ — ছাড়া নগরের সমস্ত বেচা-কেনা নিয়ন্ত্রণ ক'রতো।

(ঙ) নগরের ব্যবসায়ী, বণিক ও শিল্পীরা — যাপন করতেন বলে — নগরগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দশম অধ্যায় । মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্য

(ক) মধ্যযুগে চীন

প্রথম পাঠ : তাং আমলে চীনের একত্রীকরণ : আইনের পুনর্গঠন

ইউরোপ যখন বর্বর জার্মাণ উপজাতিদের আক্রমণে বিধ্বস্ত আর ওখানে চলেছে ভাঙাগড়ার খেলা তখন চীনে একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদয় হয়। এই সাম্রাজ্যের নাম তাং সাম্রাজ্য (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ)। তাং রাজারা সার্থক সামরিক অভিযান করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে চীনের প্রাচীর অতিক্রম করে গোবি মরুভূমি, পশ্চিম দিকে তুর্কীস্থান পার হয়ে পারস্যের সীমা ও কাস্পিয়ান সাগর থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি তাঁদের সাম্রাজ্যের সীমা ছিল। দক্ষিণের সীমা তিব্বত অতিক্রম করে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর উত্তর-পূর্বে কোরিয়া ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দৈর্ঘ্যে এই সাম্রাজ্য প্রায় ৫,৬৪০ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৩,৯৭০ মাইল বিস্তৃত ছিল। সমসাময়িক পৃথিবীতে এটা ছিল বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে এর আয়তন অনেক বড় ছিল। তবে চীনা ঐতিহাসিকরা এর এলাকা যত বিস্তৃত বলে দাবী করেন কার্যক্ষেত্রে তত বড় ছিল কিনা তা' নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সন্দেহ ও মতভেদ আছে।

আইনের পুনর্গঠনের জন্য তাং যুগ স্মরণীয়। তাং রাজারা দেশের প্রচলিত আইনকে চার ভাগে বিভক্ত করেন—(১) ফৌজদারী আইন (২) শাসন সম্বন্ধীয় আইন (৩) এই দুই শ্রেণীর আইনের ব্যাখ্যা ও (৪) এইসব আইন প্রয়োগ করার উপবিধি। এই আইনগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি তাং কোড বা আইন সংহিতা নামে পরিচিত। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রহিত করা এবং অপরাধীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ এই সংহিতায় দেওয়া হয়েছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনেকাংশে মানবিক করা হয়েছিল। তাং কোডে সম্পত্তি

বিষয়ক কোন আইন নেই। চীনদেশের লোকেরা বিশ্বাস ক'রতো যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিবাদ তাদেরই মীমাংসা করা উচিত। তাই এই কোড শাসন ও ফৌজদারী বিষয়ক বিধি রচনা, ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় পাঠ : তাং যুগের সাংস্কৃতিক জীবন : শিক্ষা, বিদ্যাচর্চা, সাহিত্য, চারুকলা ও মুদ্রণ

চীনদেশে সে সময় শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়। বেসরকারী ও সরকারী দু' প্রকার বিদ্যালয়ই ছিল। সিয়ানের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আট হাজারেরও বেশী ছাত্র পড়াশোনা করতেন। এখানে মূলতঃ প্রাচীন সাহিত্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'তো। তাং যুগ থেকেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হ'তো। উচ্চপদপ্রার্থীদের কনফিউসিয়াসের ও প্রাচীন সাহিত্যের ওপর প্রশ্ন করা হ'তো। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে প্রধানমন্ত্রীর পদ পাওয়াও অসম্ভব ছিল না। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই শাসন করবার অধিকারী—এই ছিল প্রচলিত মতবাদ।

এই যুগে চীনে অনেক বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে হান উ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে পাণ্ডিত্যের জন্য সবাই খুব সম্মান ক'রতো। আর এক বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন জাং-জি-হো। তিনি এত ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে বিনা টোপে নদীর ধারে মাছ ধরতেন।

তাং যুগ গীতিকবিতার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ যুগের গীতি-কবিতা চীনা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করে আছে। তাং যুগের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি ছিলেন লী পো। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে চাইতেন না। নৌকা করে বিহার করতে করতে এই গভীর প্রকৃতি-প্রেমিক কবি চাঁদ ধরতে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং জলে ডুবে মারা যান। টুফু ছিলেন আর একজন বিখ্যাত গীতি-কবি ; তবে তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির এবং তাঁর কবিতায় ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।

তাং যুগে চারুশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়। বহুমূল্য মণিমুক্তা সংগ্রহ, ছবি আঁকা, চীনামাটি বা পোর্সিলেনের পাত্র নির্মাণ করে তাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা—এই সব চারুশিল্পে চীনাদের সৌন্দর্যপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

চীনারা মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছে। চীনেই প্রথম বই ছাপানো আরম্ভ হয়েছিল। সমস্ত পৃথিবী এর জন্য চীনাদের কাছে ঋণী। তাং যুগেই প্রথম কাঠের হরফে ও পরে ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভাল অক্ষরে মুদ্রণ শুরু হয়।

তৃতীয় পাঠ ঃ চীনে বৌদ্ধধর্ম ও তার প্রসার ঃ আদর্শ দেশরূপে চীন ঃ হিউয়েন সাঙ্‌-এর ভারত ভ্রমণ

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়। খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণের সমুদ্র ও উত্তরের বাণিজ্যপথ দিয়ে যে সব বণিক চীনে যেতেন তাঁদের মাধ্যমেই এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। তারপর অনেক প্রচারকদলও এখানে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও কুমারজীবের নাম উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের শেষ অবধি সময়কে চীনের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বলা হয়। এখানে অসংখ্য বৌদ্ধমঠ গড়ে ওঠে এবং অগণিত লোক এই ধর্মে দীক্ষিত হন। কনফিউসিয়াসের মতবাদ চীনাবাসীর মনের ক্ষুধা মেটাতে পারেনি। তাই তারা বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের ফলে ইউরোপের যেমন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বৌদ্ধধর্ম চীনে তা' করতে পারেনি। চীনের বৌদ্ধধর্ম ও ভারতের বৌদ্ধধর্মে অনেক পার্থক্য ছিল। প্রাচীন চীনা ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। চীনা ধর্মীয় চিন্তাধারায় অনেক নতুন ধারণা যথা মুক্তি, কর্মবাদ, আত্মার বিভিন্ন দেহধারণ, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু চীনের প্রাচীন চিন্তাধারা নষ্ট হয় নি।

এই যুগেই চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া, জাপান ও শ্যামদেশে বিস্তৃত হয়। বৌদ্ধস্তূপ চীনে এসে প্যাগোডায় রূপান্তরিত হয় এবং সারা পূর্ব এশিয়ায় তখন প্যাগোডা নির্মাণের ধূম পড়ে যায়। এই সময়ে চীনের সরকার ও সংস্কৃতিকে তারা অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। তাং সভ্যতার একটা সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা সহজেই চীনা সভ্যতা গ্রহণ করতে পারতো।

চীনদেশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে **হিউয়েন সাঙ**-এর জন্ম হয়। তখনকার চীনে বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। পাছে বাইরের লোক গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরীর কায়দা শিখে ফেলে তাই এই কড়াকড়ি। বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান পরিদর্শন ও ধর্মশিক্ষার উদ্দেশে হিউয়েন সাঙ গোপনে দেশত্যাগ করেন। তাঁকে

হিউয়েন-সাঙ

ধরবার জন্য লোক ছুটেছিল। কিন্তু তিনি গোবি মরুভূমিতে পালিয়ে এলেন। দুস্তর প্রান্তরে দিক হারিয়ে ফেললেন। অনেক কষ্টে পশু ও মানুষের কঙ্কাল দেখে তিনি পথ অন্বেষণ করে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তাঁর সঙ্গীরা তুষার-নদীতে জমে গিয়ে প্রাণ হারায়। কখনও তৃষ্ণার জলের জন্য, কখনও-বা প্রচণ্ড তুষারপাতে তিনি অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছেন।

কোন ক্রমে তিনি **তি-এন-সান্** রাজ্যে প্রবেশ করলেন। এটা ছিল তুর্কীদের রাজ্য। এখানকার রাজাকে 'খান' বলা হ'তো। হিউয়েন-সাঙ-এর কাছে বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা শুনে খান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হ'লেন আর গুরুকে একজন দো-ভাষী এবং যাত্রার পাথেয় দিলেন। এরপর তাঁরা সমরখন্দে এলেন। সমরখন্দ তখন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। এখান থেকে তিনি গান্ধারে আসেন। তারপর তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। ষোলো বছর ভারতে কাটিয়ে অনেক
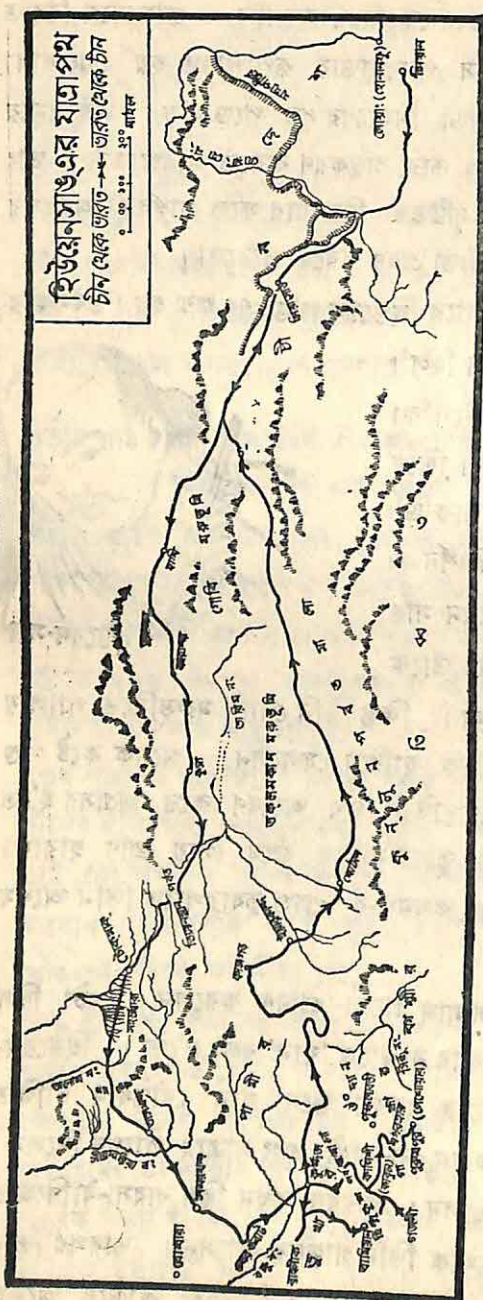
পুঁথিপত্র, ছবি এবং বুদ্ধের সোনা, রূপা ও চন্দন কাঠের মূর্তি নিয়ে তিনি দেশে ফিরে যান।

হিউয়েন সাঙ দেশে ফিরে এলে তাং সম্রাট তাইৎসুঙ্গ তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি রাজধানী সিয়ান থেকেই চুয়াত্তরটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তাঁর যাত্রার বিবরণও লিপিবদ্ধ করেন। এই বইটির নাম, "সি-ইউ-কি" বা পশ্চিমাঞ্চলের বিবরণ।

হিউয়েন সাঙের ভারত পরিভ্রমণের ফলে চীন ও ভারত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। চীনের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে ভারতে আসবার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। চীনারা ভারত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারে। হিউয়েন সাঙের

কাছে হর্ষবর্দ্ধনের কথা শুনে তাং সম্রাট তাঁর রাজদরবারে দু'বার রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন।

চতুর্থ পাঠ : কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চা

কৃষি : হান্ যুগের পর প্রায় চারশো বছর চীনে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার না থাকায় সামন্তরাই ভূমির মালিক হয়ে পড়েছিলেন। তাং যুগে যতদূর সম্ভব জমি চাষের অধিকার প্রজাদের দেওয়া হয়। প্রত্যেক কার্যক্ষম ব্যক্তিকে প্রায় তের একর জমি দেওয়া হয়। এই জমির $\frac{1}{5}$ অংশে তাদের গুটিপোকার চাষ করতে হ'তো। তারা শস্যাদি দিয়ে কর দিতো এবং বছরে পঁচিশ দিন বিনা পারিশ্রমিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ আর কিছুদিন স্থানীয় সরকারের কাজ করে দিতো। এর ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বড় বড় বংশের জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। রাজকোষেও ভালো সম্পদ জমা পড়ে এবং কৃষকদের অবস্থা আগের যুগের চেয়ে ভালো হয়। কৃষকদের দেশের অভ্যন্তরের সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হ'তো। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চীনের সর্ববৃহৎ খাল কাটা তাং যুগেই শেষ হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য : তাং যুগে চীনের উন্নতির মূল কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি। বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলে দেশে যথেষ্ট অর্থাগম হ'তো। তার জন্যই শিল্প ও সভ্যতার উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। এই সময়ে চীনে মিহি সূতীর কাপড়, ঘোড়া, মশলা, হাতীর দাঁতের জিনিষ প্রভৃতি আমদানী করা হ'তো। চীন থেকে রপ্তানি হ'তো রেশম বস্ত্র, সোনা, রূপা, সীসা, টিন এবং হাতে তৈরী জিনিষপত্র। কোরিয়া, জাপান ও পূর্ব প্রাচ্য চীনা দ্রব্যে ছেয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে চীনারা নৌপথে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করে। সুদক্ষ চীনা নাবিকেরা ছোট ছোট জাহাজে করে ভারত মহাসাগর দিয়ে সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত

ঘুরতো। চীনের জিনিষ কেনবার জন্য বিদেশীরা চীনে যেতেন। ক্যান্টনে বহু বিদেশী বণিক বসবাস করতেন।

চা : চতুর্থ শতক থেকেই চীনে চা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হ'তো। তাং যুগে চা সাধারণ পানীয় হিসাবে শুধু চীন দেশেই নয় অন্যত্রও ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ হয়।

পঞ্চম পাঠ : সাঙ্‌ আমলের অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা

তাং যুগে দেশের কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। এই সময়ে সাম্রাজ্য ও সমৃদ্ধি বাড়লেও অভিজাত ও সামন্ত-দের চাপে সঙ্গতিহীন কৃষকেরা অনেক পরিশ্রম করেও কষ্টেই দিন কাটাতো। সাঙ্‌ যুগে রাষ্ট্র তাদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করে। আগে চীনে এক অঞ্চলে এক এক রকম ফসল বা এক এক রকমের জিনিষপত্র তৈরী হ'তো। ব্যবসায়ীরা তা' খুব অল্প মূল্যে কিনে নিয়ে বেশী মূল্যে বিক্রী করতেন। রাষ্ট্র এই সময় কৃষক ও শিল্পীদের কাছ থেকে জিনিষ কিনে নিয়ে বেচতে আরম্ভ করে। এর ফলে উৎপাদকরা উচিত মূল্য পেলো এবং যে অঞ্চলে সেই জিনিষ হ'তো না সেখানেও কমদামেই পাওয়া যেতে লাগলো। জিনিষের দামে খুব রকমফের হ'তো না, উৎপাদকও ন্যায্য মূল্য পেতো আবার রাষ্ট্রেরও কিছু লাভ হ'তো। আগে দরিদ্র কৃষকেরা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন— সুদের হার হ'তো অস্বাভাবিক বেশী, কখনও আসলের দ্বিগুণ। রাষ্ট্র এখন কৃষকদের বছরে শতকরা কুড়ি টাকা সুদে ঋণ দেবার ব্যবস্থা ক'রলো। যদিও সুদের হার আজকের বিচারে অনেক বেশী বলে মনে হয় তবুও তখনকার আমলে এর চেয়ে সুবিধাজনক শর্তে কৃষকেরা ঋণ পেতে পারতো না। জমি জরিপ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্দ্ধারণ করা হয় এবং জমির ও সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী কর ধার্য করা হয়। ভূমি রাজস্ব ও সম্পত্তি করের হার ধাপে ধাপে বাড়তো। আগে রাষ্ট্রের জন্য প্রজাদের বাধ্যতামূলক কায়িক পরিশ্রম করতে হ'তো। এতেও পরিবর্তন করা হয়। এখন নগদ টাকা দিলে এই পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতো।

রাষ্ট্র এই সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কয়েকটা নির্দিষ্ট বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য করতে হ'তো এবং সরকারকে এর জন্য কর দিতে হ'তো। ক্রয়বিক্রয়ের ওপর শতকরা দশ থেকে কুড়ি ভাগ অর্থ সরকারকে দিতে হ'তো। সরকার কয়েকটি জিনিষের একচেটিয়া কারবার করতেন যথা চা, লবণ, মদ ইত্যাদি। অন্যান্য ব্যবসা ও বাণিজ্যের ওপরও কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। সরকার অশ্বারোহীদের ঘোড়া কিনে দিতেন এবং এই ঘোড়ার বদলে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন অশ্বারোহী সৈনিক সরকারকে দিতে হ'তো। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই যুগে কাগজের নোট প্রচলিত হয়। সরকারই নোট ছাপাতেন।

এই সব সংস্কারের ফলে গরীব মানুষ ও সাধারণ কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয়। তবে বড় জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজনরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং কায়েমী স্বার্থের লোকেরা সাঙ রাজত্বের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করতে আরম্ভ করে।

ষষ্ঠ পাঠ : সাঙ্ যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

সাঙ্ যুগে শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। তখন সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন পণ্ডিতদের বাড়ীতে শিক্ষা দেওয়া হ'তো। পণ্ডিতদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে চারটি এই সময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এখানে ভালো ছেলেদের কোন বেতন দিতে হ'তো না। তাং যুগের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে এখানে ছাত্ররা উচ্চ রাজপদ পেতে পারতো তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে কিছু পরিবর্তন করা হয়—প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের শাসন ও ব্যবহারিক বিষয়ও পড়তে হ'তো।

এই যুগে গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইউ-ইয়াং-স্তিউ গদ্য সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক। শূ-সী সুন্দর সুন্দর রচনা লিখেছিলেন। ওয়াং-এন্-শীর গদ্যরচনাও অপূর্ব। সুমা-কাঙ্ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৩ থেকে ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সময়ের ইতিহাস রচনা করে যথেষ্ট

খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর রচিত ইতিহাস অত্যন্ত প্রামাণ্য এবং বিশাল। **চেঙ্ চিয়াও** একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি জাতি, বংশ, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ে লেখবার চেষ্টা করেন। এঁর পুস্তককে চীনের সামাজিক ইতিহাস বলা যেতে পারে। চীনারা এই সময়ে গৃহনির্মাণ কলা, ভ্রমণ, উদ্যানবিদ্যা, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও পুস্তক রচনা করেছিল। এ সময়ে অনেক বিশ্বকোষও রচিত হয়েছিল।

চিত্রাংকনে সাঙ্ যুগে বিশেষ উন্নতি হয়। এঁরা পশুপক্ষী, মাছ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফল ও ফুলের অপূর্ব সুন্দর চিত্র আঁকতে পারতেন।

ধর্মীয় ব্যাপারে এটা ছিল সংমিশ্রণের যুগ। বুদ্ধের চিন্তাধারা ও কনফিউসিয়াসের ভাবধারা মিশে গিয়ে এক নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়। আধুনিক চীনের ধর্মীয় ধারণা ও সংস্কার এই যুগেই গড়ে ওঠে।

সপ্তম পাঠ : ইউয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ) : মোঙ্গল ও কুবলাই খাঁ (তিব্বতীয় বৌদ্ধ)

দ্বাদশ শতকের শেষভাগে মোঙ্গল নামে একটা জাতি ইতিহাসের পটভূমিতে উদিত হয়। এই দুর্ধর্ষ জাতির আদিম নিবাস ছিল মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থান ও উত্তর এশিয়ায়। তারা প্রথমে মধ্য এশিয়ার তৃণভূমিতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতো। তারা তাঁবুতে বাস ক'রতো ; মাংস ও ঘোটকীর দুধ খেতো। তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল পশুপালন, শিকার ও যুদ্ধবিগ্রহ। যুদ্ধে তারা ছিল অসীম সাহসী এবং তীর ধনুকের ব্যবহারে ছিল সুনিপুণ। তারা আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতে হূণ ও তুর্কীদের সমগোত্রীয় ছিল।

চেঙ্গিস খাঁ নামে এদের এক নেতা দুর্দান্ত মোঙ্গলদের সংগঠিত করে বিভিন্ন স্থানে সামরিক অভিযান চালিয়ে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। চীনের কিছু অংশ, পশ্চিম তুর্কীস্থান, পারস্য, আর্মেনিয়া, ভারতে লাহোর পর্যন্ত এবং দক্ষিণ রাশিয়া ও পশ্চিম হাঙ্গেরী ও সাইলেশিয়া তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এই

সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয় এবং চীনদেশও তাঁদের অধীনে চলে আসে।

কুবলাই খাঁ তাঁর রাজধানী পিকিং-এ স্থানান্তরিত করেন। তিনি চীনের ইউয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন মোঙ্গলদের প্রধান খাঁ। তাঁর আমলে মোঙ্গলরা চীনা সংস্কৃতিই গ্রহণ করেছিল। ধর্মের বিষয়ে তাঁরা **তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম** পালন করতেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম স্থানীয় ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এক নতুন ধরনের বৌদ্ধ ধর্ম এখানে প্রবর্তিত হয়, যাকে লামাবাদ বলা হয়। কুবলাই এই ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ফাগ্-পা নামে একজন তিব্বতী লামা তাঁর গুরু ছিলেন এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁকে উপদেশ দিতেন। তাঁর আমলে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও লামাদের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। লামারা কুবলাই খাঁকে চক্রবর্তী বলতো। লামারা চীন দেশে অনেক প্রথা (নাচ ইত্যাদি) চালু করে। এদের প্রভাবে চীনে নাটক ও উপন্যাস রচনায় বিশেষ উন্নতি হয়েছিল।

কুবলাই খাঁ

অষ্টম পাঠ ঃ মার্কো পোলোর বিবরণ

ভিনিসের তু'জন সওদাগর, নিকোলো পোলো ও তাঁর ভাই মাফিও পোলো বাণিজ্যের কাজে কুবলাই খাঁর রাজসভাতে আসেন। তাঁদের মুখে খ্রীষ্টধর্ম ও পোপের কথা শুনে কুবলাই খাঁ এক শ' খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর রাজসভায় পাঠাবার জন্য পোপকে একটা চিঠি দেন। সেই চিঠি নিয়ে পোলোরা দেশে ফিরে আসেন। তু'বছর পরে

দু'জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে তাঁরা চীন যাত্রা করেন। এই সময় নিকোলোর সাথে তাঁর পুত্র মার্কো পোলো ছিলেন। বুদ্ধিমান মার্কো পোলো অতি অল্প সময়ে তাতার ভাষা ভালো করে রপ্ত করেছিলেন। তিনি অল্প-কালের মধ্যেই কুবলাই খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্রাট তাঁকে হ্যাংচাও প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজকার্যে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে যেতে হয়েছে। সতের বছর চীনে কাটাবার পর সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের জন্য এক রাজকন্যাকে নিয়ে জলপথে তিনি পারস্য যাত্রা করেন। সুমাত্রা ও ভারতবর্ষ হয়ে দু'বছর পরে পারস্যে উপস্থিত হন। রাজকুমারীর বিবাহ হয়ে গেলে তিনি দেশে ফিরে যান।

মার্কো পোলো

চব্বিশ বছর পর মার্কোপোলো ভিনিসে ফিরে আসেন। তিনি তাতার পোষাক পরে ফিরেছিলেন বলে তাঁর বাড়ীর লোকেদের তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয়। ভিনিসের সঙ্গে জেনোয়ার যুদ্ধের সময় তিনি বন্দী হন। কারাগারে তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী বন্দীদের কাছে বিবৃত করেন। তাঁদের মধ্যে একজন এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে "মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী" নামে তা' প্রকাশ করেন। এ কাহিনী এত চমকপ্রদ যে প্রথমে কেউ বিশ্বাস ক'রতো না। পরে প্রমাণিত হয়েছে যে এর মধ্যে অনেক সত্য আছে। এই বইটি ইউরোপীয়দের প্রাচ্যের এক অভিনব জগতের সন্ধান দিলো। এই বইটি কলম্বাসকে নতুন দেশ আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করেছিল।

মার্কো পোলো কুবলাই খাঁর রাজসভা ও তৎকালীন চীনদেশের মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন। কুবলাই খাঁ ছিলেন শিক্ষিত এবং ধর্মের
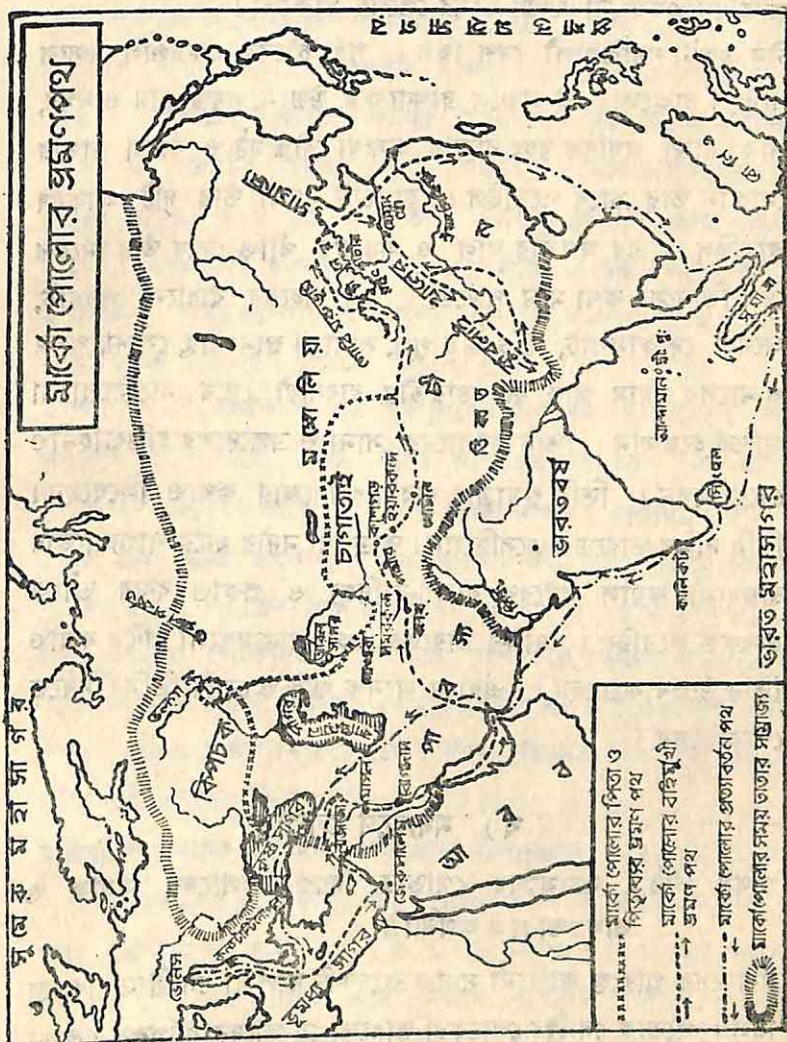
ব্যাপারে উদার। সকল ধর্মের প্রচারকদের তিনি সমাদর করতেন। সম্রাটের রাজপ্রাসাদের নাম ছিল খান্‌বলিক। এর প্রাচীর ছিল ৫০ ফুট উচ্চ এবং ২০ ফুট চওড়া। ঘরের দেওয়ালগুলি ছিল চিত্রিত;

সম্রাটের চার জন পত্নী ছিল। প্রধানা মহিষীর নাম ছিল জমুই খাতুন। প্রাসাদের উদ্যানে অনেক পশুপাখী, এমন কি চিতাবাঘও ছিল। প্রতিদিন একটা না একটা উৎসব লেগেই থাকতো।

চীন একটা সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। পূর্ব চীনের ক্ষেত্রগুলি ফসলে পরিপূর্ণ থাকতো। এই অঞ্চলে দ্রাক্ষাক্ষেত্র, উদ্যান, সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগর, পাকা রাস্তা, অগণিত বৃহৎ বাজার, অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও বারো হাজার দোকান তাঁর চোখে পড়েছিল। হ্যাংচাউ নগরী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর অগভীর খাল ও সমুদ্রের খাঁড়ি দেখে তাঁর নিজের দেশ ভিনিসের কথা মনে পড়তো। এই শহরের বাঁধানো পথঘাট, অনেক দোকানপাট, উঁচু উঁচু পুল, সাধারণ স্নানাগার, সোনা, পশম ও মালের গুদাম আর বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী দেখে মার্কোপোলো আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি জাপানের সোনা ও ব্রহ্মদেশের হস্তিবাহিনীও দেখেছিলেন। তিনি সুমাত্রার ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও লিখেছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতেও এসেছিলেন। তাম্রপর্ণী নদীর ধারে পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী কয়াল নগরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রকাণ্ড বন্দর তাঁকে চমৎকৃত করেছিল। দক্ষিণ ভারতের এক পরাক্রমশালী রাণীর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে অনেক ঋষি ও যোগী তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

(খ) মধ্যযুগে জাপান

প্রথম পাঠঃ মধ্যযুগের গোড়ার দিকে জাপানের সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি

মধ্যযুগের প্রারম্ভে জাপানী সমাজ কয়েকটি দলে বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকেরা ভাবতো যে তাদের পূর্বপুরুষ একজন ছিলেন এবং তারা তাঁরই বংশধর। তাই এগুলিকে একটি বংশের পরিবার বলা যেতে পারে। এই বৃহৎ পরিবারগুলির একজন প্রধান থাকতেন আর সেই প্রধানের আদেশ সবাই মোটামুটি মান্য ক'রতো।

প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব দেবতা ছিল এবং গোষ্ঠীপতিরাই এঁদের প্রধান পুরোহিতের দায়দায়িত্ব নির্বাহ করতেন। জাপানী ভাষায় এই রকম গোষ্ঠীগুলিকে উজি বলা হয়।

এই রকম একটা গোষ্ঠী ছিল **ইয়ামাতো** গোষ্ঠী। তার প্রধানই হতেন সম্রাট। এঁরা ছিলেন সূর্যদেবীর বংশধর এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির নেতা। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা যেমন বাড়তো প্রধান গোষ্ঠী-পতির বা সম্রাটের ক্ষমতা তেমনি কমতো। আবার সময়ে সময়ে এঁদের ক্ষমতা কমে যেতো। তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উজি প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী হতেন। তবে একদিকে এঁদের ক্ষমতা অটুট থাকতো। ধর্মের ব্যাপারে রাজবংশই ছিল প্রধান এবং এদের প্রধান পুরোহিতের স্থান কেউ টলাতে পারতো না।

জাপানের ধর্ম বলতে প্রথমে পূর্বপুরুষের উপাসনা বোঝাতো। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে একে **শিণ্টু** নামে অভিহিত করা হয়। এই ধর্মের ভিত্তি ছিল প্রকৃতির প্রতি প্রেম ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। প্রকৃতির উপাসনা থেকে এই ধর্মের উৎপত্তি হ'লেও আসলে এটা সূর্যদেবীর উপাসনায় পরিণত হয়। পবিত্রতা ছিল এই ধর্মের মূল কথা। স্নান করে পবিত্র হয়ে প্রকৃতির লোকহিতকর কাজকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানানোই ছিল এই ধর্মের প্রধান জিনিষ। যেহেতু রাজবংশের লোকেরা সূর্যদেবীর বংশধর, সেই জন্য জাপানীদের চোখে তাঁরা ছিলেন সম্মানের পাত্র। ধর্মীয় দৃষ্টিতে রাজপরিবারের বিশেষ স্থান ছিল।

উজিরা ছিল শাসক সম্প্রদায়, তাই তারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না —নিজেরা জমি চাষ ক'রতো না। শাসন করাই তাদের কাজ ছিল। যারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের বলা হ'ত **বি**। এরা নামে স্বাধীন ছিল কিন্তু কাজে এদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। এই শ্রমিকেরা বৃত্তি বা স্থান অনুসারে দলবদ্ধ হ'তো। সাধারণতঃ 'বি'রা একটি উজির সঙ্গে যুক্ত থাকতো। সেই উজির যাবতীয় কাজ এরা ক'রতো। যে গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকতো সেই গোষ্ঠীর দেবতা এদের দেবতা

হ'তেন। উজি বা গোষ্ঠীর প্রভুদের সেবা করাই ছিল এদের ব্রত। এরা প্রভুদের জন্য দরকার পড়লে যুদ্ধও ক'রতো।

তৃতীয় ধরনের লোক ছিল ক্রীতদাস। এরা 'উজি'দের গৃহকর্ম করতো। জাপানে ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব কম ছিল—একশো জন লোকের মধ্যে ক্রীতদাসের সংখ্যা পাঁচ জনের বেশী ছিল না।

দ্বিতীয় পাঠ : জাপানে চীনা প্রভাব ও বড় বড় পরিবারের প্রতিরোধ

প্রাচীন যুগ থেকেই চীনা ভাবধারা জাপানকে প্রভাবিত করে। চীন থেকে বহুলোক জাপানে আসেন। তাঁদের শিক্ষা, শিল্পকলা, পাণ্ডিত্য এবং দর্শন চীন দেশ থেকে এসেছিল কিন্তু তবুও চীন ও জাপানের সংস্কৃতি এক হয়ে যায় নি। এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে একটা বিশেষত্ব দিয়েছে। জাপান প্রাচীন বা মধ্যযুগে বিদেশীদের পদানত থাকেনি। সে নিজ সভ্যতায় যা নিয়েছে তা' ইচ্ছা করে এবং নিজের মত করেই নিয়েছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে মধ্য জাপানে **ইয়ামাতো** গোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে। এরা চীনা সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বংশানুক্রমিক শাসন এবং সৈনিক-অভিজাতদের ধারণা এদের কাছ থেকেই জাপানে অনুপ্রবেশ করে। জাপানে সম্রাটের প্রভুত্বের তিনটি চিহ্ন—আয়না, তরবারি ও গহনা এদের কাছ থেকেই জাপানে গৃহীত হয়েছে। ইয়ামাতো গোষ্ঠীর ধর্মীয় ভাবনাও জাপান গ্রহণ করেছে পঞ্চম শতকের গোড়া থেকে চীনের প্রত্যক্ষ প্রভাব জাপানে বাড়তে আরম্ভ করে। চীনাদের লিখিত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবর্তিত হয় এবং অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। জাপানী বৌদ্ধরা চীনে যেতে আরম্ভ করেন এবং চীনা সভ্যতার প্রচারক হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এই চীনানুরাগী জাপানীরা ইয়ামাতো রাজসভাতে বিশেষ প্রভাবশালী দলে পরিণত হন। চীনের তাং যুগে জাপানে চীনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করা হয়। সমস্ত জমি সরকারের অধীনে আনবার ও গোষ্ঠীতন্ত্র

ভাঙবার চেষ্টা হয়। অষ্টম শতকে চীনের অনুকরণে নগর প্রতিষ্ঠা করা হয়—চীনা শিক্ষাই জাপানের শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। চীনা শিল্পকলাও জাপানে প্রবর্তিত হয়। চীনা অনুকরণে কর ধার্য, স্থানীয় শাসন, ভূমি রাজস্ব নীতি গ্রহণ ইত্যাদি আমরা দেখতে পাই। তাই সপ্তম ও অষ্টম শতককে চীনা প্রভাবের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

কিন্তু জাপানে চীনা প্রভাব স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে নি তার প্রধান কারণ হ'লো বড় **উজিদের** প্রতিরোধ। সম্রাট যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন তাঁকে তখন সেই অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত লোককেই নিযুক্ত ক'রতে হ'তো। চীনের মত এখানে কোন পণ্ডিত-শাসক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। চীনের বৌদ্ধধর্মও এখানে পরিবর্তিত হয়ে জাপানী বৌদ্ধধর্ম হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু জাপানী শিণ্ট ধর্মে মিশে যায়। ভূ-স্বামীদের ও গোষ্ঠীপতিদের অধিকার এবং ক্ষমতায় কোন পরিবর্তন আসে নি।

তৃতীয় পাঠ ঃ মিকাডো

বিদেশীরা জাপানের সম্রাটকে **মিকাডো** বলে। ধর্মীয় দিক থেকে জাপানের সম্রাটেরা ছিলেন সূর্যদেবীর বংশধর, জাপানের সবচেয়ে পবিত্র বংশের লোক। জাপানের সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তাঁরা ছিলেন প্রধান হোতা। তাঁরাই হ'তেন ধর্মের প্রধান ব্যাখ্যাতা। মধ্যযুগে তাঁদের এই ক্ষমতা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তোলে নি। যত দিন গেছে তাঁদের স্থান সুরক্ষিত হয়েছে জাপানীদের মনে। সম্রাট বলতে আমরা শাসনের সর্বপ্রধানকে বুঝে থাকি। কিন্তু জাপানে সম্রাটের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তিনি রাজত্ব করতেন কিন্তু শাসন করবার সব ক্ষমতাই তাঁর হাত থেকে সামন্তদের হাতে চলে যায়। তবে তিনি **শোগূন** বা প্রধান শাসককে অভিষিক্ত করতেন। তিনি নামে প্রধান শাসক হয়ে **কিউটোতে** বাস করতেন। সম্রাটের হাত থেকে সমস্ত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর হ'তে আরম্ভ হয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে। এই সময়ে জাপানের সমাজ দুই ভাগে ভাগ হয়ে

যায়—শাসক ও শাসিত। শাসক সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল প্রধানতঃ বেসামরিক আমলাদের নিয়ে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এইসব আমলার পদ বংশানুক্রমিক হয়ে গেলো এবং কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার থেকেই আমলা ও রাজপুরুষদের নিযুক্ত করা হ'তো। এর জন্য তাঁদের ধানের জমি দেওয়া হ'তো আর এই জমির জন্য কোন কর দিতে হ'তো না। আশপাশের ধানের জমির ওপরও অগ্রাধিকারের সত্ত্ব ভোগ ক'রতো অর্থাৎ এইসব জমি প্রথমে এঁদেরই ভোগদখল করতে দিতে হ'তো। এর ফলে শাসকেরা বিরাট বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হয়ে গেলেন।

রাজাকে খরচ চালাবার জন্য ধেনো জমির ওপর খাজনা বাড়াতে হ'লো। ফলে ছোট চাষীরা জমি রাখা সুবিধাজনক বলে মনে ক'রতো না। তারা তখন বড় বড় ভূ-স্বামীদের জমি দিয়ে তাঁদের জমিতে চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলো। এই পদ্ধতি বাড়তে লাগলো। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বা সম্রাটের আয় কমে গেলো এবং স্বভাবতঃ ভূমির মালিকানা বড় বড় সামন্তদের হাতে চলে এলো ; আর সম্রাট নামেই সম্রাট হয়ে রইলেন।

চতুর্থ পাঠ ঃ শোগুন

বড় বড় ভূ-স্বামীদের হাতে জমি ও শাসন ক্ষমতা যাওয়ার ফল হ'লো যে এঁরা সামরিক ক্ষমতারও অধিকারী হ'লেন। এঁদের সম্পত্তি ও আশ্রিতদের রক্ষা করবার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন হ'তো। দ্বিতীয়তঃ, নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার জন্যও সামরিক শক্তির দরকার ছিল। আস্তে আস্তে সামন্তরা সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলেন। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রভাবশালী সামন্তরা সম্রাটকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করেছেন এবং ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সম্রাট সামন্ত-নায়কদের হাতের ক্রীড়নক হয়েছেন। শোগুন কথার অর্থ হচ্ছে বর্বরদের দমনকারী প্রধান সেনাধ্যক্ষ। অর্থাৎ এটা একটা পদের নাম। যে সামন্তনায়ক সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণে এনে

দেশের শাসন পরিচালনা করতেন তাঁকে শোগূন বলা হ'তো। দেশের শাসন করার ক্ষমতা এই শোগূনদের হাতে থাকতো। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে **টকুগোয়া** পরিবার থেকেই এঁরা নিযুক্ত হ'তেন। সম্রাটেরা শোগূনকে নিযুক্ত করতেন এবং সেই পদে অভিষিক্ত করতেন। তাঁরা সম্রাটের নামে দেশ শাসন করতেন। কিন্তু আসলে শোগূনেরাই সব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং প্রথম দিকে সবচেয়ে বড় সামন্তনায়ককে ও পরে বিশেষ এক পরিবারের লোককেই সম্রাট শোগূন নিযুক্ত করতে বাধ্য ছিলেন। সামন্তরা শোগূনদের রাজধানী **ইয়াডো**-তেই আসতেন। সম্রাটের সঙ্গে শাসনের ব্যাপারে তাঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না।

পঞ্চম পাঠ ঃ সামুরাই ও বুশিডো

জাপানে বড় বড় সামন্ত ও সামরিক নায়কের পদ যে শ্রেণীর হাতে চলে আসে সেই সম্প্রদায়কে **সামুরাই** বলা হ'তো। সামাজিক দৃষ্টিতে এঁদের স্থান ছিল সম্রাটের নীচে এবং এঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। কিন্তু শক্তি ও বিশেষ অধিকারের দিক থেকে এঁদের স্থান ছিল সম্রাটেরও ওপরে। এঁরা সামন্ত-সামরিক শ্রেণী অর্থাৎ আসল শাসক শ্রেণীর লোক ছিলেন। সামুরাই শ্রেণীর লোকদের কোনরকম কায়িক পরিশ্রম করতে হ'তো না। এঁরা অনেক বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। অবশ্য সামুরাই সম্প্রদায়ের মধ্যে শোগূন থেকে সাধারণ যোদ্ধারাও ছিলেন। কিন্তু সামুরাই বলতে সাধারণতঃ তাঁদেরই বোঝাতো যুদ্ধ যাঁদের বৃত্তি ছিল।

প্রাচীন জাপানের সেরা লোকেরা শাসক ও যোদ্ধা দুই-ই ছিলেন। চীনে এঁদের দমন করা হয়েছিল। শাসন থেকে যোদ্ধাদের আলাদা করবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু জাপানে তা' করা সম্ভব হয় নি। দ্বাদশ শতক থেকে এঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তখন এঁদের নাম হয় সামুরাই। চীনের শাসনে পণ্ডিত-শাসকদের আধিপত্য ছিল কিন্তু জাপানে সামরিক শক্তির অধিকারী সামুরাইদের প্রাধান্য ছিল। এঁরা সমাজের অন্যস্তরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। নিজেদের সমাজের বাইরে বিবাহও করতে পারতেন না। জাপানে তাই ইউরোপীয় সশস্ত্র সামন্তদের মত একটি যোদ্ধা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

যুদ্ধের সময় এঁদের ডাকা হ'তো এবং যুদ্ধ করাই এঁদের কাজ ছিল। অন্য সময়ে এঁরা অলস জীবনযাপন করতেন।

বুশিডো কথার অর্থ 'যোদ্ধাদের জীবন-প্রণালী'। ইউরোপে সামন্ততন্ত্র থেকে যেমন শিভ্যালরির সৃষ্টি হয়েছিল, জাপানেও ঠিক তেমনি সামুরাই থেকে 'বুশিডো'র সৃষ্টি হয়। সামুরাই সম্প্রদায়ের লোকেদের জীবনে কী কী করা উচিত—বুশিডো তাই সূচিত করে। যেহেতু প্রাচীন কাল থেকেই জাপানে সামরিক শক্তির অধিকারী লোকেদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল এবং তারা দেশের শাসনে অংশ গ্রহণ ক'রতো তাই সৈন্যদের কর্তব্য ও ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম তৈরী করার প্রয়োজন ও সুযোগ ছিল। এই নিয়মগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে এবং খুব কম সময়েই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বুশিডো একটা সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করে। সাধারণভাবে বুশিডো বা যোদ্ধাদের জীবন প্রণালী দাবী করতো যে যোদ্ধাদের এইসব গুণের অধিকারী হ'তে হবে—সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা, নম্রতা, আন্তরিকতা, সম্মানবোধ, অর্থের প্রতি অনাসক্তি এবং আত্মসংযম। সকল সামুরাই যে এইসব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তা' আমরা বলতে পারি না। হয়তো অনেকেই এত গুণের অধিকারী হ'তে পারতেন না। কিন্তু সামনে একটা বড় আদর্শ না থাকলে কোন সমাজ বা সম্প্রদায় টিকতে পারে না। সামন্ত প্রথার পাকেচক্রে মানুষ যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত তখন এমন একটা উচ্চ আদর্শের প্রয়োজন ছিল। অনেকের মত হ'লো, ধর্মের শিক্ষা ও জাপানের যুদ্ধ প্রীতির সম্মিলিত ফল হ'লো বুশিডো।

অনুশীলনী

১। মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ

(ক) লী পো কে ছিলেন? তিনি কোথাকার লোক ছিলেন?

(খ) 'হান্ উ' কেন বিখ্যাত?

(গ) কোন্ সময়কে চীনে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ বলা হয়?

(ঘ) যে বইতে হি উয়েন সাঙ-এর যাত্রার বিবরণ আছে তার নাম কি?

(ঙ) তাং যুগে চীন থেকে কি কি রপ্তানি হ'তো?

(চ) কুবলাই খাঁ কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন?

(ছ) 'উজি' বলতে কী বোঝ?

(জ) শোগূন কথার অর্থ কী ?

(ঝ) বুশিডো কথার অর্থ কী ?

(ঞ) মধ্যযুগে জাপানের সম্রাটেরা কোথায় থাকতেন ?

২। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কীভাবে হয়েছিল এবং এর ফল কী হয়েছিল ?

৩। সাঙ্ যুগে সাধারণ মানুষের উপকার করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় ?

৪। ভুলগুলো কেটে দাও :

(ক) মধ্যযুগের চীনের যোদ্ধারা/পণ্ডিতরা উচ্চপদে আসীন হতেন।

(খ) মিকাডো/শোগূন মধ্যযুগের জাপানে আসল শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন।

(গ) জাপানের সম্রাটেরা সূর্যদেবের/সূর্যদেবীর বংশধর।

(ঘ) সামুরাইদের কায়িক পরিশ্রম করতে হ'তো/হ'তো না।

(ঙ) চীনে/জাপানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ছাত্ররা উচ্চ রাজপদ পেতো।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) সমসাময়িক পৃথিবীতে তাং সাম্রাজ্য ছিল—সাম্রাজ্য এবং— সাম্রাজ্যের চেয়ে এর আয়তন অনেক — ছিল।

(খ) চীনেই — বই ছাপানো হয়েছিল।

(গ) সমরখন্দ তখন ছিল — জন্য বিখ্যাত।

(ঘ) হিউয়েন সাঙ্ দেশে ফিরে এলে তাং সম্রাট — তাঁকে বিশেষ সম্মান করেন।

(ঙ) চতুর্থ শতক থেকেই চীনে — ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত।

(চ) — খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৩ থেকে ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সময়ের — রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন।

(ছ) — নামে একজন তিব্বতী — তাঁর গুরু ছিলেন।

(জ) কুবলাই খাঁ — ও ধর্মের ব্যাপারে — ছিলেন।

(ঝ) জাপানে ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব — ছিল এবং একশো জনের মধ্যে ক্রীতদাসের সংখ্যা — জনের বেশী ছিল না।

(ঞ) শোগূন নামে প্রধান শাসক হয়ে — বাস করতেন।

৬। যার পাশে যা বসে তাই বসাও :

যোদ্ধাদের জীবনপ্রণালী,	কুবলাই খাঁ,
শোগূনদের রাজধানী,	বুশিডো,
জাপানের সম্রাট,	কুমারজীব,
তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম এবং	মিকাডো এবং
চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার।	কিউটো।

একাদশ অধ্যায় | মধ্যযুগীয় ভারত
(পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক)

প্রথম পাঠ : হূণ আক্রমণ ও তার গুরুত্ব

পাশ্চাত্য জগৎ হূণ আক্রমণের চাপে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতনও ঘটেছিল। ঠিক এই সময়ে ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্য তাদের একটি শাখার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই শাখাকে শ্বেত হূণ বলা হয়। এরা ওক্সাস্ নদীর উপত্যকা থেকে এসে পারস্যদেশ অধিকার করে। তারপর তারা আফগানিস্থানের দিকে অগ্রসর হয় এবং গান্ধার জয় করে। এখান থেকেই তারা ভারত আক্রমণ পরিচালনা করে। তবে গুপ্ত রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই বীর রাজার মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে হূণেরা **তোরমানের** নেতৃত্বে পাঞ্জাব থেকে মালবের এরান পর্যন্ত অধিকার করে। তাঁর পুত্র **মিহিরকুল** পাঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল বা শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করেন। হূণদের বিতাড়িত করবার জন্য গুপ্ত সম্রাটেরা এবং উত্তর ভারতের সামন্তরা, কখনও এককভাবে, কখনও সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মান্দাশোরের শিলালেখ দাবী করে যে যশোধর্মদেব বলে একজন সামন্ত তাদের মালব থেকে বিতাড়িত করেন। মিহিরকুল কাশ্মীরে পালিয়ে যান এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। হূণদের হিংস্রতা ও নির্মমতার অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এরা বিভিন্ন দলনায়কের অধীনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরও কিছুদিন রাজত্ব করেছিল।

হূণ আক্রমণের গুরুত্ব : ভারতের ইতিহাসে হূণ আক্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে ওঠে এবং তার পতনের গতি ত্বরান্বিত হয়। তবে একথা বলা উচিত নয় যে হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে কারণ নানা কারণে তার পতন ঘনিয়ে আসছিল। দুর্বল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে হূণদের বাধা দেওয়া

সম্ভব ছিল না। তাই সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব এসে পড়ে ছোট ছোট রাজা ও সামন্ত এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নায়কদের হাতে। যারা এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হ'লো তাদেরই ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলো। ইউরোপে নর্সম্যান, শ্লাভ্ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণ যেমন সামন্ততন্ত্রের বিকাশকে সাহায্য করে, এবং বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে, ভারতেও হূণ আক্রমণ তেমনি স্থানীয় সামন্তদের বা সুযোগ্য সেনানায়কদের সামনে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়। হূণ এবং তাদের সঙ্গে অনেক উপজাতি ভারতে আসে। এদের মধ্যে গুর্জরদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব লোকেদের আগমনের ফলে ভারতীয় সমাজ ও রীতিনীতিতে বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়। অনেকে মনে করেন, এইসব বিদেশীদের রক্তের মিশ্রণে রাজপুত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় জিনিষ ছিল যে বিভিন্ন সভ্যতার ধারাকে ভারতীয় সভ্যতার মহাসাগরে লীন করে দেওয়া। হূণদেরও ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়। তারাও হিন্দু হয়ে যায়, তাই এদের মুদ্রায় বৃষমূর্তি দেখা যায়। শৈবধর্মের একটা প্রতিকৃতি ছিল বৃষ। হূণ আক্রমণের সময়ে তক্ষশীলার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ : গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন

সম্রাট স্কন্দগুপ্তের পর থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হ'তে আরম্ভ করে। বুধগুপ্ত ছিলেন এই সাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। রাজপরিবারে ক্ষমতার লড়াই, সামন্তদের ক্ষমতালিপ্সা, সামরিক শক্তির অবনতি এবং বিদেশী আক্রমণের চাপে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। স্বভাবতই অনেক ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। মগধে গুপ্ত নামধারী রাজারা রাজত্ব করতেন। এই গুপ্ত রাজারা কিন্তু আসল গুপ্তবংশের লোক নন। পরে তাঁরা মালবে চলে আসেন এবং রাজত্ব করেন। কণৌজে মৌখরি, থানেশ্বরে পুষ্যভূতি ও সৌরাষ্ট্রে মৈত্রক বংশ রাজত্ব গড়ে তোলে। কামরূপ, বঙ্গদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানেও

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে কে প্রধান হবে তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হ'লো। থানেশ্বর, কণৌজ আর কামরূপ জোট বাঁধলো মালব আর গৌড়ের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধে কণৌজের রাজা নিহত হলেন। থানেশ্বর আর কণৌজ—দু' দেশেরই রাজা হ'লেন হর্ষবর্দ্ধন। তিনি কণৌজ থেকেই একচল্লিশ বছর দেশ শাসন করেন।

তৃতীয় পাঠঃ হর্ষবর্দ্ধনের যুগ

হর্ষবর্দ্ধনের এই একচল্লিশ বছর দেশ শাসন উত্তর ভারতের ইতিহাসে গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হর্ষ চেষ্টা করেছিলেন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়বার। অনেক রাজাই হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য
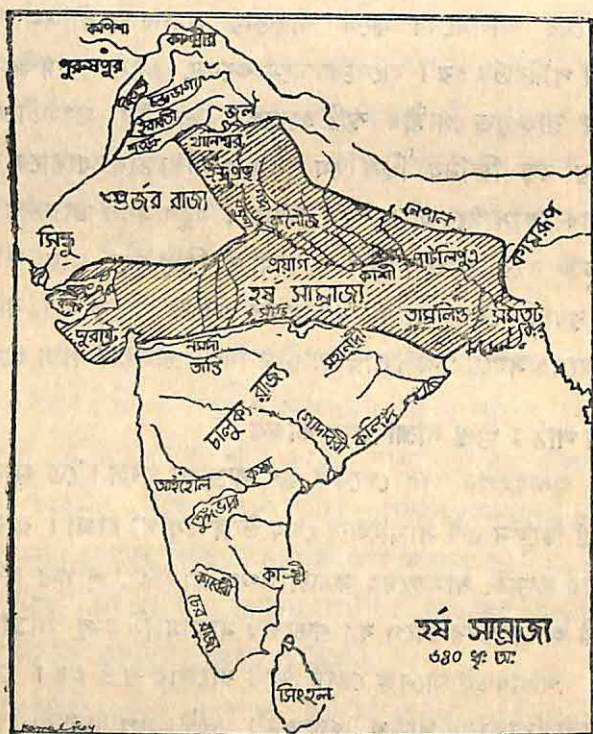
হন, যেমন মগধের গুপ্তরাজা, কামরূপের ভাস্করবর্মা, বল্লভীর ধ্রুবসেন ইত্যাদি। হর্ষ দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে চালুক্যরাজ পুলকেশী দ্বিতীয়র কাছে পরাজিত হন। তাই তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে

ফিরে এসেছিলেন। তবে উত্তর ভারতে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত, এবং পূর্বে কামরূপ থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁর অধীনে ছিল। কেউ কেউ আবার বলেন যে তিনি নেপাল, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ জয় করেছিলেন। অনেকে আবার বলেন যে, শুধু পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মগধ, কঙ্গোদ ও কলিঙ্গ নিয়েই হর্ষের রাজ্য ছিল অর্থাৎ তিনি সমস্ত উত্তর ভারতেরও রাজা ছিলেন না। বাতাপীরাজ পুলকেশী তাঁকে উত্তরপথনাথ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর রাজত্বের বিস্তার যাই হো'ক, হর্ষ একজন বড় রাজা ছিলেন।

তবে তিনি উত্তর ভারতে কোন সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। সে সময়কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিল যাতে করে কোন সাম্রাজ্য গড়া সম্ভব ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সম্রাটের পক্ষে সামন্তদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। গুপ্তযুগেই স্থানীয় শাসনের ওপর কেন্দ্রের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ যুগে আধিকারিকদের বেতন জমি অনুদানের মাধ্যমে দেওয়া হ'তো। শুধু সামরিক বাহিনীর লোকেদের নগদ টাকাতে বেতন দেওয়া হ'তো। ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রের আয়ের মূল উৎস। এই পরিস্থিতিতে হর্ষের ব্যক্তিত্বই ছিল সাম্রাজ্যের বাঁধন।

হর্ষবর্দ্ধন

অস্তমিত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলেও একাধিক কারণে হর্ষের রাজত্বকাল স্মরণীয়। এ সময়ে সাহিত্যের বিকাশ হয়। হর্ষ নিজে একজন নাট্যকার ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। বলা হয়, রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা নামে তিনখানি নাটক তাঁর রচনা। কাদম্বরী নামে প্রসিদ্ধ

আখ্যানের লেখক বাণভট্ট তাঁর সভাসদ ছিলেন। তিনি হর্ষের জীবনকথা লিখেছেন। এই গ্রন্থের নাম হর্ষচরিত।

ধর্মে হর্ষ ছিলেন উদার। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শৈব এবং পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের ওপরও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেও তিনি শিব ও সূর্যের উপাসনা করতেন। তাঁর আমলে প্রজাদের কল্যাণমূলক অনেক কাজ করা হয়েছিল—পথঘাট নির্মাণ, সরাইখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। বিভিন্ন মঠ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বদাই তিনি চেষ্টা করতেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে হর্ষ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে একটা মেলার অনুষ্ঠান করতেন। প্রয়াগে এইরকম কয়েকটা মেলা হয়েছিল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ যখন কণৌজে আসেন তখন হর্ষ অতিথির সম্বর্দ্ধনার জন্য একটা ধর্মসভার আয়োজন করেন। এর পর হর্ষ প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে গিয়ে দান মেলার অনুষ্ঠান করেন। তিন দিন ধরে খুব ধুমধাম চলতো। প্রথম দিন বুদ্ধের পূজা দ্বিতীয় দিন সূর্যের আর তৃতীয় দিন শিবের অর্চনা করা হ'তো। প্রত্যেক দিন বৌদ্ধ শ্রমণ, জৈন পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও দীনদরিদ্রদের অর্থ দান করা হ'তো। পাঁচ বছরের রাজস্বের উদ্বৃত্ত দান করে তিনি একটি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করতেন। কাজেই হর্ষের যুগ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়।

চতুর্থ পাঠ : হিউয়েন সাঙের বিবরণ

হর্ষের রাজত্বকালে চৈনিক পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ্‌ ভারতে এসেছিলেন। তিনি প্রায় চোদ্দ বছর ভারতে কাটান। তাঁর বিবরণ থেকে হর্ষের শাসনব্যবস্থা, তাঁর ধর্ম, সেইযুগের শিক্ষা ও সাহিত্য এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা যায়।

এই সময়ে কণৌজ অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল। পাটলিপুত্র তার পূর্ব

গৌরব হারিয়েছিল। প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নগর বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল। দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও ধর্ম নিয়ে কোন বিরোধ হ'তো না। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে উৎপীড়ন ক'রতো না। শিক্ষিত সমাজে দেবভাষা সংস্কৃতের প্রচলনই বেশী ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭০০০ বৌদ্ধ মঠ ছিল। কাশ্মীর, জলন্ধর, কণৌজ, বৈশালী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি জায়গায় অনেক ভিক্ষু ও পণ্ডিত মঠে থেকে লেখাপড়া চর্চা ও ধর্ম আলোচনা করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশদ বিবরণ তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

দেশের ভিতরকার অবস্থাও তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়। তখনকার দিনে পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকেদের জমি দেবার ব্যবস্থা ছিল। উত্তর ভারতের পথঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না। রাস্তায় চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। হিউয়েন সাঙ্‌কে দু'বার ডাকাতের হাতে পড়তে হয়েছিল। তবে সমাজবিরোধীদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। সাধারণ লোক ছিল শান্তিপ্রিয় এবং নীতিজ্ঞানসম্পন্ন। তারা অপরের দ্রব্য কেড়ে নিত না। তারা ছিল ধর্মভীরু এবং কাউকে প্রতারণা ক'রতো না। তারা কথা দিয়ে কথা রাখতো। সাধারণের জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তবে তারা মাংস খেতো। সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছিল। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভালোভাবেই চলতো। পশ্চিম ভারতে মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে বিদেশের বাণিজ্য হ'তো। তাম্রলিপ্ত দিয়ে চীন ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলতো।

তিনি উত্তর ভারতের হর্ষ সাম্রাজ্য, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজ্য ও সুদূর দক্ষিণের পল্লব রাজত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হর্ষ ধর্ম ও সুশাসনের জন্য, চালুক্যরা বীরত্ব ও শিল্পচর্চার জন্য এবং পল্লবেরা শিল্পচর্চা ও বিদ্যাচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

পঞ্চম পাঠ : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগের শিক্ষার ইতিহাসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খুবই বিখ্যাত।

এখানে আগে একটা মঠ ছিল এবং সেই মঠেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শিক্ষা দেওয়া হ'তো। ফা-হিয়েনের আমলেও এখানকার শিক্ষাকেন্দ্রের তেমন কোন সুনাম ছিল না, তবে হূণদের আক্রমণে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হবার পর রাজা, বণিক, সামন্ত ও জনসাধারণের দানে উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে এই মহাবিদ্যালয়টি গড়ে ওঠে।

এখানে সুপণ্ডিত আচার্য ও অধ্যাপকেরা ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। হিউয়েন সাঙের ভারত পরিভ্রমণের সময়ে এখানে ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে এই মঠের পুরানো ঘর-দুয়ার ও বাড়ীঘর সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যে অংশ পাওয়া গেছে তা' একটা বড় গ্রাম জুড়ে অবস্থিত ছিল। এখানে কত মূর্তি, কত স্তূপ ও সীলমোহর পাওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নেই। বলা হয়, এই মঠটি ছ'তলা ছিল। তিনতলা অবধি সিঁড়ি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছাত্রদের ভিড় লেগে থাকতো। কিন্তু ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন শতকরা মাত্র কুড়ি জন। তবুও এখানে পড়বার আকর্ষণে চীন, তাতার, কোরিয়া, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার নানা দেশ থেকে ছাত্ররা আসতো। প্রায় দশ হাজার ছাত্র এখানে জ্ঞানলাভ ক'রতো। অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। "রত্নসাগর", "রত্নদধি" ও "রত্নরঞ্জক" নামে তিনটি প্রকাণ্ড পাঠাগার ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করার জন্য একটা মানমন্দিরও ছিল।
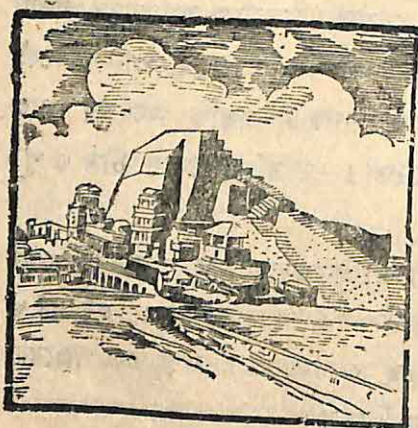
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্য আটটি হলঘর এবং তিনশ'টি পাঠকক্ষ ছিল। প্রায় একশো স্থানে একশ'টি বিষয়ে সারাদিন পড়াশোনা চলতো। ছাত্রদের থাকবার উপযোগী বিরাট বিরাট দালানঘরের ব্যবস্থা ছিল।

নালন্দাতে প্রধানতঃ মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ানো হ'তো। তবে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র ও বিষয়কে অবহেলা করা হ'তো না। জৈন ধর্মশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতিও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে দিঙ্‌নাগ, ধর্মপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রজ্ঞামিত্র, চন্দ্রপাল এবং শীলভদ্র প্রভৃতি চরিত্রে ও বিদ্যাবত্তায় সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যেতেন চীন, যবদ্বীপ, সিংহল, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। নালন্দার ছাত্রদের জীবন ছিল কঠিন নিয়মের অনুশাসনে বাঁধা। শাস্ত্র আলোচনা, স্থবির অধ্যাপকের ওপর ভক্তি, ধর্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতাই ছিল নালন্দার মহাবিদ্যালয়ের আদর্শ। তর্ক, জিজ্ঞাসা ও পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করাই ছিল এখানকার পাঠ্যরীতি। তুর্কী আক্রমণে এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস হয়।

হর্ষের পরবর্তী যুগ [অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী]

ষষ্ঠ পাঠ: ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান; পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্যন্ত উত্তর ভারতে কোন শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে নি। ভাস্করবর্মার অধীনে কামরূপ রাজ্য শক্তিশালী হলেও তাঁর মৃত্যুর পর এর গৌরবের অবসান হয়। উড়িষ্যায় শৈলেন্দ্ররা কিছুদিনের জন্য প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। সৌরাষ্ট্র ধ্রুবসেনের অধীনে কিছু সংহতি লাভ করেছিল, কিন্তু এখানে স্থায়ী কোন শক্তির উত্থান হয় নি। কণৌজে যশোবর্মন বলে একজন নৃপতি কিছুটা বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি গৌড়ের রাজাকে পরাজিত

করেছিলেন এবং গৌড়ের সীমানা থেকে নর্মদা নদী অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রাজসভাকে ভবভূতির মত নাট্যকার ও বাক্‌পতিরাজের মত কবি অলংকৃত করতেন। কিন্তু তিনিও বেশীদিন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন নি। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের হাতে তিনি নিহত হন। কাশ্মীরের গৌরবও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল।

অষ্টম শতকে বাংলা দেশে পালবংশ, রাজপুতানায় গুর্জর প্র তহার এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট শাসনের উত্থানের ফলে কিছুকাল উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল।

হর্ষের সময় থেকেই কণৌজ নগরের গৌরব বাড়ে এবং এই নগরের সমৃদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কণৌজ নগরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য পালরাজাদের সঙ্গে গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ হয়।

সপ্তম পাঠঃ 'রাজপুত' জাতি, তাদের রাজত্বের চরিত্র ও একচ্ছত্র রাজ্যস্থাপনে অক্ষমতা

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতে, এমন কি দাক্ষিণাত্যে যে সব রাজবংশ রাজত্ব করেছেন তাঁদের অধিকাংশই রাজপুত জাতির লোক। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এঁরা নিজেদের ভারতের আদি বাসিন্দা বলে দাবী করেন। এমন কি সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি পৌরাণিক বংশের লোক বলেও দাবী জানান। তবে এটা ঘটনা যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে এই জাতির অস্তিত্বের কোন নিদর্শন আমরা পাই না আর অষ্টম শতক থেকেই এঁদের ইতিহাসের পটভূমিতে দেখা যায়। তাই ঐতিহাসিকদের ধারণা হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদের ভারতীয়দের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলেই এঁদের উদ্ভব। পারমার, প্রতিহার, চৌহান ও সোলাঙ্কীরা নিজেদের 'অগ্নিকূল' বলে দাবী করেন অর্থাৎ তাঁরা বলেন যে যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছে। যজ্ঞের আগুন থেকে মানুষের উদ্ভব হ'তে পারে না। তাই ঐতিহাসিকদের মত এই যে এঁরা

বিদেশী এবং প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ করে ভারতীয় সমাজে স্থান পেয়েছিলেন। তবে এ কথাও সত্য যে সব রাজপুতেরা বহিরাগতদের বংশধর নন; যেমন চান্দেল্ল বা গহড়বালগণ। হর্ষবর্দ্ধনের পর থেকে ত্রয়োদশ শতক অবধি যুগকে ভারতীয় ইতিহাসে রাজপুত যুগ বলা হয়। রাজপুতদের মধ্যে চৌহান, পারমার, তোমর, চান্দেল্ল, গহড়বাল, কলচুরি, গুর্জর প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম শতক থেকে দশম শতকের শেষভাগ অবধি দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা রাজত্ব করেছিলেন আর প্রায় সেই সময়েই উত্তর ভারতে গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গুর্জর প্রতিহারদের পতন গুজরাটে চৌলুক্য বা সোলাঙ্কী, আজমীঢ়ে চৌহান, বুন্দেলখণ্ডে চান্দেল্ল, জব্বলপুরে কলচুরি, মালবে পারমার এবং কণৌজে গহড়বাল বংশ প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। এই বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যগুলি সার্বভৌম স্থান পাওয়ার জন্য পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন।

মধ্যযুগের ইউরোপে যেমন বড় বড় সামন্তদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছিল তেমনি রাজপুত যুগেও ভারতে পূর্ণমাত্রায় সামন্ততন্ত্র বিরাজ ক'রতো। রাজপুত রাজারা তাঁদের ভূমি সামন্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন এবং এ যুগে শূদ্রেরা চাষবাস ক'রতো আর ক্ষত্রিয় রাজপুতেরা যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত থাকতেন। তবে ইউরোপের নাইট্‌রা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাতেন না। কিন্তু ভারতের এই সামন্ত নরপতিরা শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চান্দেল্লদের খাজুরাহো ও রাষ্টকূটদের ইলোরাতে কৈলাসনাথের মন্দির এবং চৌলুক্য সিদ্ধরাজ জয়সিংহ, পারমার ভোজদেব প্রভৃতির কাজকর্ম প্রমাণ করে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেও শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের বিকাশ সম্ভব। ভূমি ব্যবস্থার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে এ সময়ে অর্দ্ধ ক্রীতদাসরাই চাষবাস ক'রতো ও সমস্ত উৎপাদন ক'রতো। বাণিজ্যের বিকাশ হয়নি বললেই হয়। সামন্তরা রাজার জন্য যুদ্ধ করবার শর্তেই জমি পেতেন এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি বংশেরই প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছিল।

রাজপুত যুগে কোন বড় রাজ্য স্থাপিত হয় নি। তার সবচেয়ে বড় কারণ হ'লো রাজপুত রাজাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক রাজপুত গোষ্ঠীর যোদ্ধাদের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের শাসনের সঙ্গে যোগ ছিল না। বড় সৈন্যদল গঠন করাও সম্ভব ছিল না আর প্রত্যেক শাসকবংশ নিজেকে অন্য শাসকবংশের চেয়ে কম ভাবতেন না। যখন কোন রাজা রাজ্য বিস্তার করবার চেষ্টা করেছেন তখন অন্যেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে বাধা দিয়েছেন। তাই ব্যর্থ হয়েছে পারমার ভোজদেব, কলচুরী লক্ষ্মীকর্ণ প্রভৃতির প্রচেষ্টা। এঁরা নিজেদের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন যে এঁদের মধ্যে থেকে কারুর পক্ষে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল।

অষ্টম পাঠঃ শশাঙ্ক

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ প্রথমে স্বাধীন হয় আর গৌড়ে একটা শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শশাঙ্ক প্রথম জীবনে গুপ্তসম্রাট মহাসেনগুপ্তের সামন্ত ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি)। তিনি দক্ষিণবঙ্গ, দণ্ডভুক্তি, কঙ্গোদ এবং উৎকল জয় করেন। বাংলার পশ্চিমে মগধেও তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল।

বিহারের প্রভুত্ব নিয়ে কণৌজের রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। তাঁকে দমন করবার জন্য কণৌজ, থানেশ্বর ও কামরূপের রাজারা জোট বাঁধেন। শশাঙ্কও মালবের রাজাদের সঙ্গে মিত্রতা করে আত্মরক্ষা করেন। হর্ষবর্দ্ধন শত চেষ্টা করেও শশাঙ্ককে তাঁর রাজত্ব থেকে বিতাড়িত করতে পারেন নি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই হর্ষ মগধ জয় করেছিলেন আর কামরূপের ভাস্করবর্মন গৌড় ও কর্ণসুবর্ণে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্ক যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন প্রবল প্রতাপে গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল, কঙ্গোদ প্রভৃতি শাসন করেছেন। কাজেই শশাঙ্কই ছিলেন সারা বাংলাদেশের প্রথম সম্রাট যাঁর রাজত্ব বিহার ও উড়িষ্যা অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই বোধহয় সর্ব

প্রথম বাংলার একজন রাজা যিনি উত্তর ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদের ওপর শশাঙ্কের অত্যাচারের নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার এই চীনা পরিব্রাজক যখন কর্ণসুবর্ণে যান তখন সেখানে অনেক বৌদ্ধ মঠ দেখতে পান। এর থেকে মনে হয় শশাঙ্ক নীতিগতভাবে পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না তবে হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় হয়তো বৌদ্ধরা এবং বৌদ্ধমঠগুলি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সুতরাং শশাঙ্ক শৈব হলেও পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না।

নবম পাঠ : পাল ও সেনযুগে বাংলার সমাজ জীবন

এই যুগে বেশীর ভাগ লোক গ্রামেই বাস ক'রতো আর কৃষিই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। তবে দু'চারটে বড় শহর যে ছিল না তা' নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কার্যে নিযুক্ত থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোক জীবনধারণ ক'রতো। বহুদূর দেশেও বাংলার তৈরী সূতীর কাপড় ও শিল্পজাত দ্রব্যের বেশ সমাদর ছিল।

ধানই ছিল প্রধান শস্য। তা ছাড়া আখ, তূলা, সরিষা, পান ও নানারকম ফলের চাষ হ'তো। প্রতি গ্রামে বাস্তু, কৃষি-জমি ও গোচারণ—এই তিন ভাগে জমিগুলি বিভক্ত ছিল। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামেই উৎপন্ন হ'তো। কুমোর, স্যাকরা, শাঁখারী, তাঁতি প্রভৃতি কারিগরদের নিজেদের সংঘ ছিল। পরে এইসব সংঘই জাতি হিসাবে পরিচিত হয়। অনেকের ধারণা যে আজকাল বাঙালীদের মধ্যে যে সব জাতি দেখা যায় সেগুলির উদ্ভব পাল ও সেন আমলেই হয়েছে।

সে যুগে বাঙালীর খাদ্য বর্তমান কালের মতই ছিল। ভাত, মাছ, মাংস, শাক ও ফলমূল, দুধ ও দুধের তৈরী জিনিষ ছিল বাঙালীর প্রধান খাদ্য। বাঙালী ব্রাহ্মণেরা আমিষ খেতেন। রুই ও ইলিশ মাছ ছিল সকলের প্রিয় খাদ্য। পূর্ববঙ্গের লোকেরা শুঁটকী মাছ বেশ

পছন্দ ক'রতো। পুরুষেরা মালকোঁচা দিয়ে খাটো ধুতি পরতো আর মেয়েরা গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা শাড়ী পরতো। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে পুরুষেরা গায়ে চাদর দিতো। মেয়েরা গায়ে ওড়না দিতো। নারী ও পুরুষ উভয়েই কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে আংটি ও পায়ে মল পরতো। বিবাহিতা মেয়েদের হাতে শাঁখা থাকতো। পুরুষেরা বাবরি চুল রাখতো, অনেক সময় এই বাবরি কাঁধের ওপর এসে পড়তো। তখনকার লোকেরা কাঠের খড়ম, চামড়ার চটি ও ছাতা ব্যবহার ক'রতো। মেয়েরা নানা রকম কায়দা করে খোঁপা বাঁধতো। মেয়েদের প্রসাধনে আলতা, সিঁদুর ও কুম্কুমের প্রচলন ছিল। দাবা খেলা, পাশা খেলা প্রভৃতি ছিল সে যুগের বাঙালীর অবসর সময় কাটাবার প্রধান অবলম্বন। নাচ, গান, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাদন প্রভৃতি ছিল আমোদ-প্রমোদের প্রধান ব্যবস্থা। বাঁশী, ঢোল, মৃদঙ্গ, ঢাক, করতাল প্রভৃতি বাজনার খুব প্রচলন ছিল। পুরুষেরা সাঁতার, কুস্তি, শিকার ও বাজিকরের খেলা পছন্দ ক'রতো। যানবাহনের মধ্যে ছিল গরুর গাড়ী আর নৌকা। বড় লোকেরা হাতী, ঘোড়া ও রথ ব্যবহার ক'রতো। সমুদ্রপথে চলাচলকারী বাণিজ্যপোতও ছিল বলে মনে হয়। বিয়ের পর নতুন বৌ গরুর গাড়ী করে শ্বশুর বাড়ী যেতো। সমাজে নারীর স্থান বিশেষ উঁচু ছিল না। বিধবারা নিরামিষ খেতেন। মহিলারা নানা ব্রত উদ্‌যাপন করতেন। সহমরণ প্রথাও ছিল তবে খুব ব্যাপক ছিল না বলেই মনে হয়। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান আজকের মতই ছিল। 'বারো মাসে তের পার্বণ' লেগেই ছিল। এককথায় বলতে গেলে পাল ও সেনযুগের বাঙালী জীবন আর আজকালকার জীবনযাত্রার মধ্যে খুব বেশী তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দশম পাঠ: পাল ও সেন যুগে ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা

পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং পালযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধধর্মে বেশ কিছু পরিবর্তন

লক্ষ্য করা যায়। এতে অনেক তন্ত্র-মন্ত্র মিশে যায়। সাধনার সহজ পথ প্রচার করলেন অনেক সাধক। এই সহজ পথকে বলা হয় সহজিয়া। যাঁরা এইমত প্রচার করতেন তাঁদের বলা হয় সিদ্ধাচার্য। সহজিয়া শুনতে সোজা বলে মনে হ'লেও এই ধর্ম আসল বৌদ্ধধর্মের চেয়ে অনেক জটিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাবও দেখা যায়। পালরাজাদের সময় বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতির পূজা চালু ছিল অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকও অনেক লোক ছিল। জৈন ধর্ম তখন বেশ প্রচলিত ছিল। পাল রাজারা ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সেন রাজারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব হিন্দুধর্মের এই তিন শাখার বিকাশই সেন যুগে হয়েছিল। বিজয় সেন ও বল্লাল সেন শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী। এই রাজারা চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পাল ও সেনযুগ বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই রাজবংশের অবদান অনস্বীকার্য। রামপালের সভাকবি **সন্ধ্যাকর নন্দীর** 'রামচরিত' এ যুগের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত **চক্রপাণি দত্ত** পাল যুগেরই লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক **চরক** আর শল্যবিদ **সুশ্রুতের** বই এর ওপর টীকা লেখেন। তিনি নিজেও চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেন যুগেও যথেষ্ট সাহিত্যচর্চা হয়েছিল। বল্লাল সেন "দান সাগর" আর "অদ্ভুত সাগর" বলে দু'খানি বই লেখেন। তিনি নাকি আরও বই লিখেছিলেন। তবে সেগুলি পাওয়া যায় নি। **উমাপতি ধর, শরণ, গোবর্দ্ধন,** 'পবনদূত' কাব্যের কবি **ধোয়ী,** 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের অমর কবি **জয়দেব** লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি

ছিলেন। জয়দেব পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি ; সারা ভারতেরও শেষ বড় কবি তিনিই।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে এই যুগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শশাঙ্কর সময় থেকে প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে অনুশীলনের ফলে বাংলা বর্ণমালা তৈরী হয়। পালযুগে **লুইপাদ কাহ্নপাদ** প্রভৃতি বৌদ্ধ গুরুদের রচিত 'চর্যাপদ'গুলোই সবচেয়ে প্রাচীন বাংলা ভাষার নমুনা।

শিক্ষাক্ষেত্রে পালযুগের সবচেয়ে বড় অবদান বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা। নালন্দা তাঁদের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁরা নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। সম্রাট ধর্মপালের আদেশে ভাগলপুরের কাছে **বিক্রমশীলা** বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়। কথিত আছে, শিল্পী ধীমান ও বীতপাল এই মহাবিহারের পরিকল্পনা রচনা করেন। পাঁচিল ঘেরা বিরাট জায়গার মাঝখানে ছিল বৌদ্ধ মঠ। এই বড় মঠের চারপাশে ছিল ৫৩টি ছোট মঠ এবং ৫৪টি অন্যান্য বাড়ী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি মহাবিদ্যালয় ছিল আর প্রত্যেকটিতে ১০৮ জন করে অধ্যাপক ছিলেন। মহাবিদ্যালয়গুলির মাঝখানে ছিল জ্ঞানভবন। এখানে তন্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র পড়ানো হ'তো। এখানকার অধ্যাপকদের মধ্যে রত্নাকর শান্তি, আচার্য শ্রীধর, বুদ্ধজ্ঞানপাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের প্রতিকৃতি প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত করা থাকতো। প্রায় চারশো বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্প্রতি ভাগলপুর জেলার কহলগাঁওতে খননকার্য করে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ যুগের আর একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল **ওদন্তপুরী**তে (নালন্দার কাছেই)। এখানে দর্শন, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মালোচনার কেন্দ্র হিসাবেই ওদন্তপুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। অতীশ দীপঙ্কর এখানকারই ছাত্র ছিলেন।

দক্ষিণ ভারত

একাদশ পাঠ : বাদামির চালুক্য ও কাঞ্চির পল্লব : স্থাপত্য ও শিল্পে তাদের অবদান

বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের বাদামি (বাতাপী)কে কেন্দ্র করে চালুক্য রাজ্যের উত্থান হয় ষষ্ঠ শতকে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি তাঁর অধিকারে ছিল। তিনি হর্ষবর্দ্ধনের দাক্ষিণাত্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিলেন। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্য আধিপত্যের অবসান ঘটান। চালুক্যরা দক্ষিণদিকে রাজ্য স্থাপন করতে চাইতেন এবং কাঞ্চির পল্লবদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ লেগেই থাকতো। একবার ওঁরা জিততেন, অন্যবার এঁরা—এই রকম চলেছিল প্রায় দুই শতাব্দী ধ'রে।

কাঞ্চীর পল্লবেরা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর শেষভাগ অবধি রাজত্ব করেছেন। পেন্নার ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে পল্লবেরাই প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। সিংহল অবধি তাঁদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তরে বাদামির চালুক্যদের তাঁরা কয়েকবার পরাভূত করেছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নরসিংহবর্মা। এই পল্লবরা সংস্কৃতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। মহেন্দ্রবর্মা নিজে 'মত্তবিলাস প্রহসন' নামে নাটিকা রচনা করেন। পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চি ছিল সমসাময়িক কালের সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। সংস্কৃত কবি **ভারবী** ও সংস্কৃত পণ্ডিত **দণ্ডিন** পল্লব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বলে মনে করার অনেক যুক্তি আছে।

স্থাপত্য ও শিল্পকলা : বাদামির চালুক্যরাজ্য দাক্ষিণাত্যের শিল্পকলার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে আমরা উত্তর ভারতের শিল্পশৈলীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের শিল্পশৈলীর মিশ্রণ দেখতে পাই। বাদামি ও পটত্তকলের গুহামন্দির এবং হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশে নির্মিত মন্দিরগুলি চালুক্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। চালুক্যরাজাদের

পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত সঙ্গমেশ্বরের মন্দির ও বিরূপাক্ষ মন্দির আজও বিদ্যমান। এখানে কতকগুলি সুন্দর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং নিপুণ ভাস্কর্যের নিদর্শনও লক্ষ্য করা যায়। এই ভাস্কর্য পরবর্তী হোয়সল শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। অজন্তার গুহাচিত্রে চালুক্য যুগের কয়েকটি ঘটনা প্রতিফলিত দেখা যায়। এই থেকে পণ্ডিতরা বলেন যে চালুক্য আমলে অজন্তার কয়েকটি গুহা-চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। আজ-কের পণ্ডিতদের দৃঢ় ধারণা যে **এলিফেণ্টা** (বোম্বাই এর কাছে) দ্বীপের গুহামন্দিরগুলিও চালুক্য যুগেই নির্মিত হয়েছিল। এলিফেণ্টার ত্রিমূর্তি চালুক্য শিল্পসাধনার অপূর্ব নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস আরম্ভ হয় পল্লব মন্দিরগুলির সঙ্গে সঙ্গে এবং এখানেই আমরা সর্বপ্রথম দ্রাবিড় শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত হই। কাঞ্চি ও মহাবলীপুরমে পল্লব শিল্পের নিদর্শন আজও বিদ্যমান। পাহাড় কেটে মন্দির তৈরী করা, পাহাড় খোদাই করে জন্তুর মূর্তি নির্মাণ করা এবং পাহাড়ের গায়ে ছবি খোদাই করা হ'লো পল্লব স্থাপত্য ও শিল্পের বিশেষত্ব। পাহাড়ের গায়ে মণিকারের সূক্ষ্মতা সহকারে তাঁরা কারুকার্য করেছেন। তাঁদের
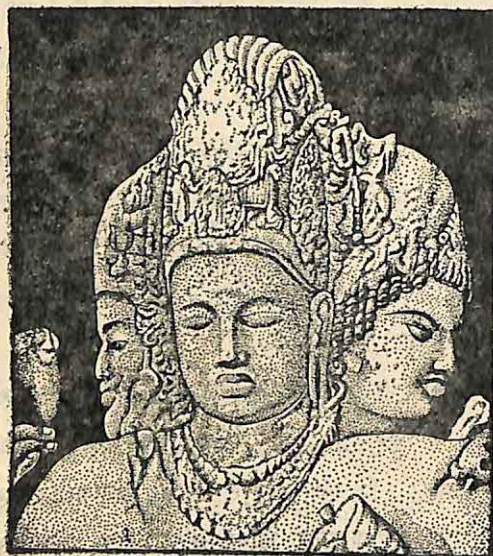
ত্রিমূর্তি

শিল্প কৌশল, সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা, অনুপাত জ্ঞান প্রভৃতি আজও আমাদের স্তম্ভিত করে। পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় কাঞ্চির ত্রিপুরান্তকেশ্বরের মন্দির, ঐরাবতেশ্বরের মন্দির এবং মহাবলীপুরমের মুক্তেশ্বর ও কৈলাশ মন্দিরে। এক একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড কেটে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দ্রৌপদী রথ, ভীম রথ, অর্জুন রথ, ধর্মরাজ রথ প্রভৃতি রথের আকৃতিবিশিষ্ট মন্দির
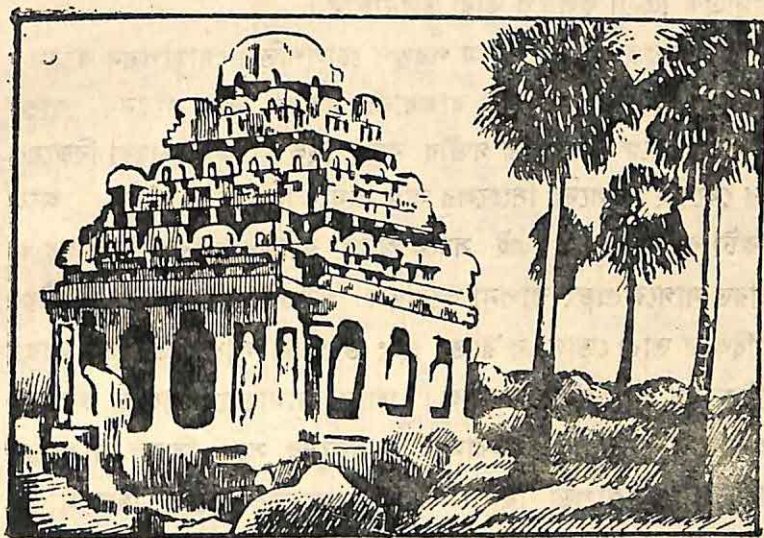
ধর্মরাজ রথ

পল্লবেরা নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের গায়ে সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শনও দেখা যায়। মহাবলীপুরমে রথের আকারবিশিষ্ট ছোট ছোট মন্দির-গুলিকে পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ধরা হয়। ভাস্কর্যের মধ্যে অর্জুনের তপস্যা নামে পরিচিত দেওয়াল চিত্রটি সত্যই সুন্দর। পাদুকোড়াইতে পল্লব যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া পাওয়া যায়। পল্লব শিল্পরীতি রাষ্ট্রকূট রাজ্যেও বিস্তার লাভ করেছিল। ইলোরার কৈলাশনাথের মন্দির পল্লব শিল্পশৈলীর অনুকরণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে এই শিল্পরীতি বিস্তার লাভ করেছিল।

দ্বাদশ পাঠ ঃ চোলদের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ

অতি প্রাচীনকালে চোল রাজাদের উল্লেখ পাওয়া গেলেও চোল রাজারা দশম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগ অবধি প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছেন। চোল রাজাদের মধ্যে রাজরাজ, রাজেন্দ্র চোল ও কলুত্তুঙ্গার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্য বিস্তার, শিল্প সাধনা ও স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষেত্রে চোলদের অবদান অনেক। কিন্তু সামুদ্রিক ক্রিয়া কলাপে তাঁরা তুলনাহীন।

দশম শতকের গোড়ায় প্রথম পরন্তপ চোলশক্তির গোড়াপত্তন করেন। তিনি দক্ষিণের পাণ্ড্যদের রাজধানী মাদুরা জয় করেন। পাণ্ড্য রাজাদের সঙ্গে সিংহলের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাই মাদুরা বিজয়ের পর থেকেই চোলদের সিংহলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'তে হ'লো। আর একটা কারণ ছিল। এই সময়ে আরব বণিকরা পারস্য উপসাগর ও ভারত সাগরে প্রভুত্ব স্থাপনা করেছিল। পশ্চিমী বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার তারা ভোগ ক'রতো এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলে তারা বণিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের নানাভাবে সাহায্য ক'রতো কেরালার শাসকরা। কেরালার শাসকদের সঙ্গে সিংহল ও পাণ্ড্য রাজাদের বোঝাপড়া ছিল। চোল রাজাদের প্রচেষ্টা ছিল আরব বণিকদের বাণিজ্যিক প্রভুত্ব ধ্বংস করা। তাঁরা সমস্ত মালাবার উপকূলকে নিয়ন্ত্রনাধীনে আনেন এবং মাল দ্বীপপুঞ্জের ওপর রাজ্যবিস্তার ক'রে ভারত মহাসমুদ্রে আরব বণিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস করেন। এই উদ্দেশে রাজরাজ সিংহলে একটা সামরিক অভিযান পাঠান। সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস হয় এবং কিছুদিনের জন্য সিংহল তাঁদের নিয়ন্ত্রনাধীনে এসেছিল।

রাজেন্দ্র চোলের আমলে পেগু, আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রীবিজয় (এই রাজ্য তখন মালয় উপদ্বীপ থেকে সুমাত্রা অবধি বিস্তৃত ছিল) নৌ-অভিযান চালানো হয়। অনেকে বলেন যে সমুদ্র পরপারে রাজ্য গড়ে তোলার জন্য এই সব অভিযান সংগঠিত

করা হয়েছিল। কিন্তু তাই যদি হ'তো তবে তারা এইসব এলাকায় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে তুলতো এবং দেশের অভ্যন্তরে যত দূর সম্ভব অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা ক'রতো। কিন্তু তারা তা করেনি।

দশম শতক থেকে ভারত ও চীনের বাণিজ্যের বেশ উন্নতি হয়। চীন থেকে স্থলপথে ব্রহ্মদেশের মাধ্যমে বাণিজ্য হ'তো। তারপর ওখান থেকে জলপথে বাণিজ্য হ'তো। চীন-ভারতে সমুদ্র পথে যে বাণিজ্য হ'তো তা' মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও সুমাত্রা দ্বীপ অতিক্রম করে আসতো। এই সময়ে শ্রীবিজয়ের লোকেরা চীন ও ভারতের বাণিজ্যপোত আটকাতো এবং তারা চীনের জিনিষ কিনে ভারতকে আর ভারতের জিনিষ কিনে চীনকে বিক্রী ক'রতো। এইভাবে এখানকার বণিকেরা মাঝ থেকে মুনাফা লুঠতো। শুধু তাই নয় শ্রীবিজয় রাজ্যে যে দক্ষিণ ভারতীয় বণিকেরা বাস করতেন তাঁদের ওপরও অনেক কড়াকড়ি ছিল। চোল রাজারা নিজেরাও বাণিজ্যে অনেক অর্থ বিনিয়োগ করতেন। এই সব কারণে তাঁরা শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পাঠিয়ে মালাক্কা প্রণালীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেন এবং সেখানকার রাষ্ট্রশক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করেন। বেশ কিছুদিনের জন্য ভারত-চীন বাণিজ্য বাড়লো এবং নিরাপদ হ'লো। দ্বাদশ শতাব্দী অবধি শ্রীবিজয় ভারত-চীন বাণিজ্যে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। চোল রাজা প্রথম কুলুতুঙ্গা বাহাত্তর জন বণিকের একটি দলকে চীনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও চীনের মধ্যে ব্যবসার উন্নতি ঘটানো।

চোলরাজাদের সামুদ্রিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার। প্রায় তিন শো বছর তাঁরা ভারত সাগরের ও চীনের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং আরবদের একচেটিয়া বাণিজ্য নষ্ট করে তাতেও ভাগ বসিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

১। মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) মিহির কে ছিলেন ?

(খ) কাদম্বরীর লেখকের নাম কি ?

(গ) নালন্দায় প্রধানতঃ কোন্ শাস্ত্র পড়ানো হ'তো ?

(ঘ) ভবভূতি কোন্ রাজার রাজসভা অলংকৃত করতেন ?

(ঙ) সারা বাংলার প্রথম সম্রাটের নাম কি ছিল ?

(চ) সন্ধ্যাকর নন্দী কি বই লিখেছিলেন ?

(ছ) 'গীতগোবিন্দম্' কোন্ কবির রচনা ?

(জ) বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল ?

(ঝ) চালুক্য আমলে অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্র অংকিত হয়েছিল মনে করবার কোন কারণ আছে কী ?

(ঞ) চোল রাজাদের সামুদ্রিক অভিযানের প্রধান লক্ষ্য কি ছিল ?

২। ভুলগুলো কেটে দাও :

(ক) হূণ আক্রমণে নালন্দা / তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়।

(খ) দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত / জয়ী হন।

(গ) পারমার / চান্দেল্লরা নিজেদের অগ্নিকুল বলে দাবী করেন।

(ঘ) পাল ও সেনযুগে ব্রাহ্মণরা আমিষ / নিরামিষ খেতেন।

(ঙ) এলিফেন্টার ত্রিমূর্তি পল্লব / চালুক্য শিল্পসাধনার অপূর্ব নিদর্শন।

৩। হূণ আক্রমণের গুরুত্ব কী ?

৪। চোল রাজারা কেন শ্রীবিজয় আক্রমণ করেছিলেন ?

৫। পল্লব শিল্পকলার কয়েকটি নিদর্শন দাও।

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) অনেক রাজাই হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন, যেমন মগধের —, কামরূপের —, বল্লভীর — ইত্যাদি।

(খ) নালন্দায় ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন শতকরা মাত্র — জন।

(গ) কণৌজ নগরের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য — সঙ্গে — ও — এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ হয়।

(ঘ) পালযুগে লুইপাদ, — প্রভৃতি বৌদ্ধ গুরুদের রচিত — গুলোই সবচেয়ে — বাংলা ভাষার নমুনা।

(ঙ) ইলোরার — মন্দির পল্লব শিল্পশৈলীর অনুকরণ।

৭। যার পাশে যা বসে তাই বসাও :

উত্তরপথনাথ, খাজুরাহো, ওদন্তপুরী, রথের আকৃতি বিশিষ্ট মন্দির ও নৌ-অভিযান।	রাজেন্দ্র চোল, অতীশ দীপঙ্কর, হর্ষ, চান্দেল্ল ও পল্লব।

দ্বাদশ অধ্যায় | ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক

তিন দিকে সমুদ্র আর উত্তরে দুর্গম পর্বতমালা ভারতকে অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করে রাখলেও স্মরণাতীত কাল থেকেই বাইরের দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। ভারত কোনদিনই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে নি। বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতীয় ধর্ম,
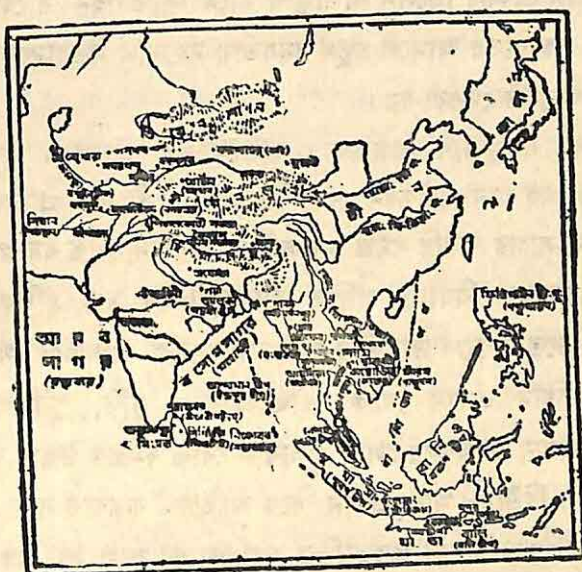
বিদেশে ভারতীয়দের বসতি

শিল্প, সভ্যতা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয়রা বসতি স্থাপনও করেছিল। এ'গুলিকে ভারতীয় উপনিবেশ বলা যায়।

প্রথম পাঠ ঃ মধ্য এশিয়া ও চীনে মহাযান ধর্মের প্রবর্তন

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমে বৌদ্ধধর্ম—মহাযান ও হীনযান দু'টি শাখাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হীনযানেরা বুদ্ধের কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি প্রস্তুত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শূন্য সিংহাসন বা বুদ্ধের পায়ের ছাপ বা কোন প্রতীক সামনে রেখে তাঁরা আরাধনা করতেন। মহাযান ধর্মমতে বিশ্বাসীরা বুদ্ধের মূর্তি তৈরী করে তাঁকে

দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করতেন। মহাযানীরা বোধিসত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। বোধিসত্ত্বের অর্থ এই যে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভের আগে অনেকবার জন্মেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে একজন্মের পুণ্য অন্য জন্মেও সঞ্চিত থাকে। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন যে বোধিসত্বরা সেই সব লোক যাঁরা মানব কল্যাণের জন্য নির্বাণ নেননি। মহাযান ধর্মের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন **নাগার্জুন** নামে সাতবাহন রাজ্যের এক পণ্ডিত। কণিষ্কের আমলে চতুর্থ ধর্মসভায় মহাযান মতবাদকে আসল ধর্ম বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ধর্মপ্রচারক ও কুশাণ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে মধ্য এশিয়াতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। চীনের প্রাচীর থেকে কাস্পিয়ান সাগর অবধি সমস্ত অঞ্চলটিতে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারিত হয়। প্রত্নতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত **অরেল্‌স্টাইন্‌** মধ্য এশিয়ার মরু-অঞ্চলে খুঁড়তে খুঁড়তে ভারতীয় সভ্যতার অনেক ধ্বংসচিহ্ন আবিষ্কার করেন। তিনি এখান থেকে বৌদ্ধবিহার ও মূর্তি, পুঁথিপত্র এবং ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লেখা মূল্যবান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ উদ্ধার করেন। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ্‌ এখান দিয়ে অতিক্রম করবার সময় যে সব চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে তা' সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তুরফানের একটি মঠে অশ্বঘোষের রচিত 'বুদ্ধচরিত'-এর মূল পুঁথিটি পাওয়া গেছে। এখানকার বৌদ্ধ মঠগুলির মধ্যে খোটান, তুরফান ও কুচির বৌদ্ধবিহারগুলি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফা-হিয়েনের সময় সবচেয়ে বড় মঠ ছিল গোমতী বিহার। হিউয়েন সাঙ্‌ খোটানের বিজিতসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। **কুমারজীব** নামে সে যুগের এক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত কুচিতে বাস করতেন। চীনারা কুচি আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী অবস্থায় চীনদেশে নিয়ে যায়। তাঁর পরিচয় পাওয়ার পর তাঁকে চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যথেষ্ট সমাদর করেছিলেন এবং কুমারজীব তাঁর শিষ্যদের সহায়তায় চারশো'র বেশী ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে ছড়িয়ে পড়ে। চীনের প্রাচীন সভ্যতার ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তীর্থভ্রমণ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ও মূর্তি সংগ্রহ করবার জন্য দলে দলে চৈনিক বৌদ্ধ ভারতে আসতেন। এদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ ও **ই-সিং** এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ই-সিং ভারতবর্ষ থেকে চার শ' ধর্মগ্রন্থ চীনে নিয়ে যান। ভারতবর্ষ থেকে বহু পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীন দেশে যান। এঁদের মধ্যে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ থেকেও পণ্ডিত **জ্ঞানভদ্র ও যশোগুপ্ত** চীনে গিয়েছিলেন। চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়ায় বিস্তার লাভ করে এবং কোরিয়া থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হয়।

আজকাল কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এই মত মানেন না। তাঁদের বক্তব্য খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে চীনের কিছু জিনিষ ভারতে ব্যবহৃত হ'তো যেমন চীনের কাপড় (চীনাপট্ট) ও চীনের বাঁশ ইত্যাদি। চীন-ভারত বাণিজ্যের সূত্র ধরে খ্রীষ্টপূর্ব '৬৫ তে প্রথম বৌদ্ধ প্রচারক দল চীনে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা **লো ইয়াং** নামক স্থানে একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু তাঁরা মধ্য এশিয়া দিয়ে গিয়েছিলেন এবং মধ্য এশিয়া তাঁদের যাতায়াতের পথে ছিল তাই এখানকার মরূদ্যানগুলিতে মঠ গড়ে ওঠে। কুশাণ সাম্রাজ্যের সময় এই বৌদ্ধ বিহারগুলি গুরুত্ব অর্জন করে এবং তখন সেখানে ভারত থেকে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা আসতেন। এঁদের মতের সারমর্ম হ'লো ভারত থেকেই চীনে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় এবং পরে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধকেন্দ্রগুলি ধর্ম প্রচারকার্যকে জোরদার করে।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ তিব্বত (অতীশ দীপঙ্কর)

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে **স্রং-সন্-গাম্পো** নামে একজন প্রতাপশালী নরপতি তিব্বতে রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। খোটান থেকে ভারতীয় বর্ণমালা নিয়ে গিয়ে

তিনি তাঁর দেশে প্রবর্তন করেন। এই সময় বহু তিব্বতীয় পণ্ডিত জ্ঞান আহরণের জন্য ভারতে আসতেন। পালবংশীয় সম্রাটেরা তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সংস্কারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন এবং পালযুগে ভারতের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধ শ্রমণরা নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলার মহাবিহারে বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতেন। কালক্রমে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মে অনেক দোষত্রুটি ও অনাচার প্রবেশ করে। তখন অতীশ দীপঙ্কর নামে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাঙালী অধ্যাপক তিব্বতে গিয়ে ধর্মীয় সংস্কার সাধন করেন।

এই বাঙালী ধর্মসংস্কারকের নাম **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ**। আনুমানিক ৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের একটি অভিজাত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী আর মাতার নাম পদ্মপ্রভা বা প্রভাবতী। ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে তাঁর দীক্ষা হয়। তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি পান।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

তারপর সুবর্ণদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি অঞ্চলে নানা পণ্ডিতের কাছে বারো বছর জ্ঞানলাভ করে তিনি পালসম্রাট মহীপালের আমন্ত্রণে বিক্রমশীলার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তিব্বতের রাজাদের বার বার অনুরোধে বৃদ্ধ বয়সে

দুর্গম হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে যান। তারপর বার তের বছর সেখানে থেকে বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কার ও প্রচার করেন। সেই সময়ে বহু ধর্মগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি তিব্বতেই দেহরক্ষা করেন। আজও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশকে তিব্বতীরা বোধিসত্ত্বরূপে পূজা করে।

তৃতীয় পাঠ ঃ সুবর্ণভূমি ঃ যশোধরপুর (আঙ্কোর ঠোম) আঙ্করভাট

মধ্য-এশিয়া ও চীনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়েছিল স্থল-পথে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর প্রসার হয়েছিল জলপথে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানাস্থানে প্রাচীন লিপি-পদ্ধতির সঙ্গে সমকালীন দক্ষিণ ভারতের লিপি-পদ্ধতির মিল দেখা যায়। স্থাপত্য-রীতিতেও দক্ষিণী প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সব অঞ্চলের সঙ্গে বঙ্গদেশেরও যোগাযোগ ছিল।

মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং কম্বোডিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশগুলিকে একত্র নাম দেওয়া হয়েছিল **সুবর্ণভুমি**। ভারতের সঙ্গে সুবর্ণভূমির যোগাযোগ যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের আগেই স্থাপিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষ করে জাতকমালা ও গুণাঢ্যের কথাসরিৎসাগরে এখানকার সঙ্গে ভারতবাসীদের বাণিজ্যের অনেক গল্প আছে। বাণিজ্যের জন্য ভারতীয়রা এখানে যেতেন এবং অনেকে বসতিও স্থাপন করতেন। ক্রমে অনেক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। কালক্রমে সৃষ্টি হয় রাজ্যের। এই সব রাজ্যগুলির নাম ছিল বিদেহ, দ্বারবতী, চম্পা, কম্বোজ, অমরাবতী প্রভৃতি। এই নামগুলো দেখলেই হিন্দু প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। যে সব রাজাদের নাম পাওয়া যায় তাও ভারতীয়। পণ্ডিতদের মতে ইন্দোচীনের সব চেয়ে বড় নদীর নাম মেকং "মা গঙ্গা" থেকেই এসেছে। এইসব অঞ্চলের আদিম লোকেরা মোটেই সভ্য ছিল না। কাজেই সুসভ্য ভারতীয়রা এখানে সহজেই

নিজেদের সভ্যতা বিস্তার করতে পারে। এখানে সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুধর্ম, ভারতীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রচলিত হয়েছিল। এখানে কোন কোন রাজা শিবের, কেউ-বা বিষ্ণুর মন্দির স্থাপন করেন। এইভাবে সুদূর সুবর্ণভূমি ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার পীঠস্থানে পরিণত হয়।

যশোধরপুর : আজকাল যাকে আমরা ইন্দোচীন বলি তার মধ্যে খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কম্বুজ নামে এক রাজ্য ছিল। কম্বুজের আধুনিক নাম কম্বোডিয়া। কম্বু নামে এক ব্রাহ্মণ এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চীনা ইতিহাস থেকে এ রাজ্যের বিষয় অনেক কিছু জানা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম এত প্রবল ছিল যে দিবারাত্র রামায়ণ পাঠ করা হ'তো। জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, সূর্যবর্মণ প্রভৃতি ছিলেন এখানকার রাজা। রাজা যশোবর্মণের সময়ে বর্তমান **আঙ্কোর ঠোম**-এ রাজধানী স্থাপিত হয়। এই রাজধানীর প্রাচীন নাম ছিল **যশোধরপুর**। নগরের প্রাচীরের পাশে ছিল প্রশস্ত খাত। সেতু দিয়ে এই খাত পার হ'তে হতো। সেতুর দু'ধারে রেলিংয়ে সাগর-মন্থনের চিত্র ছিল। পাঁচটি তোরণ পথ দিয়ে নগরে প্রবেশ করা যেতো। নগরের মাঝখানে ছিল **বেয়নের** মন্দির। এর চূড়াটি মাটিতে পড়ে গেছে। তবুও এর স্থাপত্য শিল্প দেখলে আজও আশ্চর্য হতে হয়। পিরামিডের মত তিনটি স্তরে নির্মিত এই মন্দিরের গায়ে অনেক হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী খোদাই করা আছে। এখানে সম্ভবতঃ শিবের উপাসনা হ'তো। এক সময়ে যশোধর-পুর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। বিশাল তোরণ, প্রশস্ত অলিন্দ, চত্বর ও প্রাঙ্গণে সুশোভিত এই রাজধানীতে বহু লোকের বসতি ছিল। প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে হাতী ও রথ যাতায়াত ক'রতো, হ্রদগুলিতে প্রমোদ-নৌকা ভাসতো আর মন্দিরে বাজতো কাঁসর, শঙ্খ ও ঘণ্টা।

আঙ্করভাট : কম্বুজ রাজ্যের আর একটি পৃথিবী বিখ্যাত মন্দির হ'লো **আঙ্করভাটের** বিষ্ণুমন্দির। পরিকল্পনা, গঠন ও কারুকার্যে এই মন্দির হিন্দু শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে পরম বৈষ্ণব

রাজা সূর্যবর্মণ এটি নির্মাণ করান। প্রকাণ্ড সমতল বেদীর ওপর মন্দিরটি অবস্থিত। নীচে দাঁড়িয়ে এই প্রকাণ্ড মন্দিরটির সূক্ষ্ম কারুকার্য
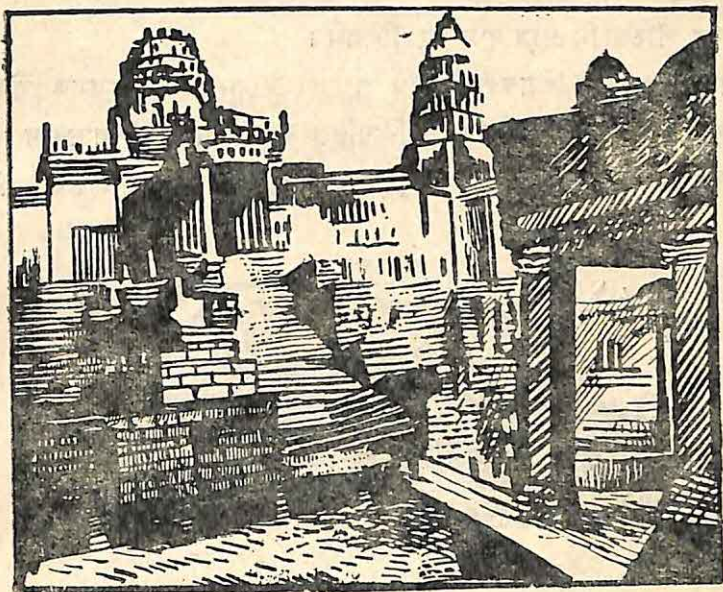
আঙ্করভাটের বিষ্ণুমন্দির

দেখলে অবাক হতে হয়। কালের প্রবাহে এই মন্দিরটির বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি।

চতুর্থ পাঠ : মালয় : জাভা : বরবুদুর

মালয় উপদ্বীপে ছিল শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্ব। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবদেশীয় বণিকেরা এ অঞ্চলে ব্যবসা করতেন। তাঁরা এই রাজ্যটিকে সবচেয়ে ধনশালী ও শক্তিশালী বলে মনে করতেন। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ। সেকালের বাংলাদেশ মহাযান-বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল। খুব সম্ভবতঃ শৈলেন্দ্র রাজারা ধর্মের ব্যাপারে পাল সম্রাটদের কাছ থেকে প্রেরণা পেতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারঘোষ বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে শৈলেন্দ্র রাজাদের গুরুর আসন গ্রহণ করেছিলেন। রাজগুরু কুমারঘোষের আদেশে

'তারা' দেবীর একটা মন্দির নির্মিত হয়েছিল। শৈলেন্দ্র রাজা বালপুত্রদেব পালবংশের দেবপালের অনুমতি নিয়ে নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল তাঁকে পাঁচখানি গ্রাম দান করেছিলেন।

শৈলেন্দ্র রাজারা শিল্পকলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা অনেক বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁদের শিল্পানুরাগ ও জাঁকজমকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন **বরবুদুরের** সুপ্রসিদ্ধ স্তূপ। জাভার এই
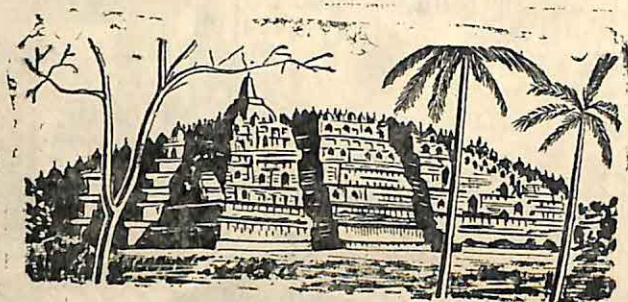
বরবুদুরের মন্দির

প্রকাণ্ড মন্দিরটি একটি পাহাড়ের ওপর আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। এতে ছাদওয়ালা ন'টা স্তর আছে। নিম্নতম স্তরটি একশ' একত্রিশ গজ। সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যভাগে আছে একটি ঘণ্টাকৃতি বৃহৎ স্তূপ। অলিন্দগুলিতেও চমৎকার কারুকার্য দেখা যায়। বিশাল স্তূপের সর্বত্র রয়েছে বুদ্ধ মূর্তি এবং রামায়ণ, মহাভারত ও জাতকের কাহিনী নিয়ে ভাস্কর্যের কাজ।

এই রাজ্যগুলির ইতিহাস গভীরভাবে দেখলে আমরা এগুলিকে 'বৃহত্তর ভারত' বলতে পারি না। কারণ এই সব অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হচ্ছে একটা উন্নততর সভ্যতার অনুন্নত সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তারের কাহিনী।

অনুশীলনী

১। মুখে মুখে উত্তর দাও :

(ক) নাগার্জুন কোন্ ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন ?

(খ) কুমারজীব কোথায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ?

(গ) আঙ্করভাটে কিসের মন্দির ছিল ?

(ঘ) মালয় উপদ্বীপে কোন্ বংশ রাজত্ব ক'রতো ?

(ঙ) কুমারঘোষ কে ছিলেন ?

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) — একটি মঠে অশ্বঘোষের রচিত — এর মূল পুঁথিটি পাওয়া গেছে।

(খ) বাংলাদেশ থেকেও পণ্ডিত — ও — চীনে গিয়েছিলেন।

(গ) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশকে তিব্বতীরা — রূপে পূজা করে।

(ঘ) রাজা যশোবর্মণের সময়ে বর্তমান — এ রাজধানী স্থাপিত হয়।

(ঙ) শৈলেন্দ্র রাজাদের শিল্পানুরাগ ও জাঁকজমকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন — সুপ্রসিদ্ধ স্তূপ।

৩। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম ক'টি শাখাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে ? চীনে কোন্ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয় ?

৪। তিনজন চীনা পণ্ডিতের নাম কর যাঁরা ভারতে বৌদ্ধধর্ম শিখতে এসেছিলেন। আর তিন জন ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুর নাম কর যাঁরা চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন।

৫। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ।

৬। যশোধরপুর নগরীর একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৭। বিদেশের ভারতীয় উপনিবেশগুলোকে কি বৃহত্তর ভারত বলা যায় ? যদি না যায় তবে কেন যায় না তা এক কথায় বল।

৮। যার পাশে যা বসে তা বসাও :

প্রত্নতত্ত্ব, তিব্বতে ধর্মসংস্কার, মেকং, যশোধরপুর ও তারা দেবীর মন্দির	কুমারঘোষ, মা গঙ্গা, অতীশ দীপঙ্কর, বেয়ন মন্দির ও অরেল্‌স্টাইন্।

ত্রয়োদশ অধ্যায় | দিল্লীর সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৫ খ্রীঃ)

প্রথম পাঠ : সুলতানী আমলে ভারতবর্ষ

তুর্ক-আফগানদের আগমন : একাদশ শতকের প্রারম্ভে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে মথুরা, থানেশ্বর, কণৌজ,
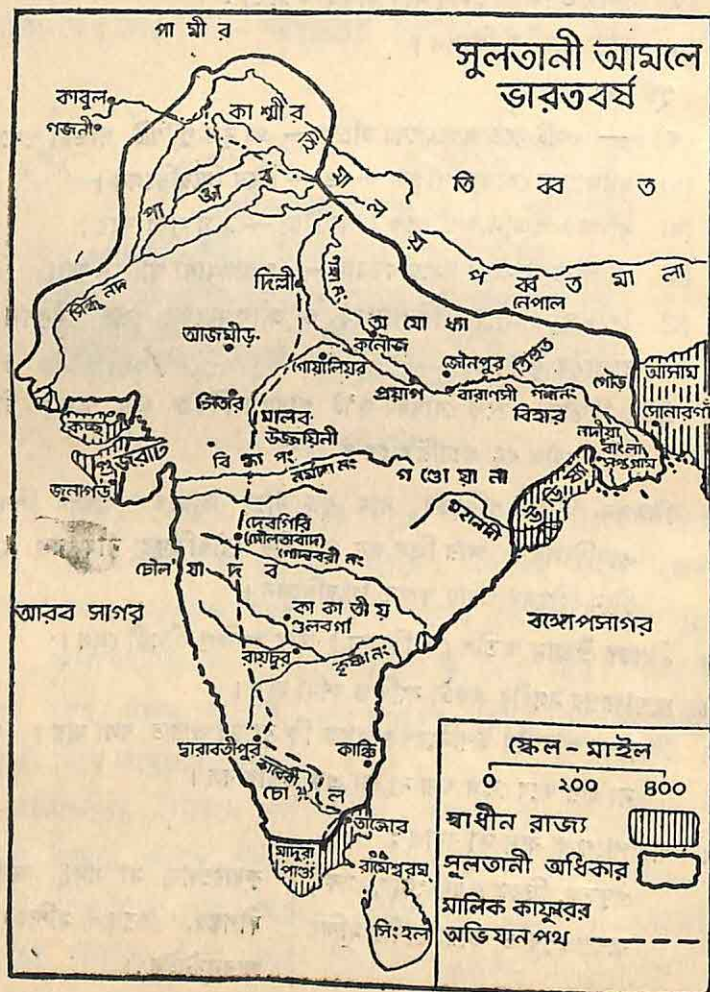
প্রভৃতি স্থানের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করেন এবং পাঞ্জাবে স্থায়ী মুসলমান

শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একশ’ সত্তর বছর পরে আফগানিস্থানের ঘুর রাজ্যের তত্ত্বাবধানে পাঞ্জাব, দিল্লী ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকৃত হয়। ঘুরী সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হ’লে তাঁর এক সেনানায়ক **কুতুব-উদ্দিন** দিল্লীতে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১২০৬ খ্রীঃ)। এই সময় থেকেই ভারতে সুলতানী রাজত্বের ইতিহাস শুরু হয়। তিনশ’ কুড়ি বছর ধরে পাঁচটি মুসলমান রাজবংশ—তুর্ক-আফগান, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী বংশ এখানে রাজত্ব করে। এই আমলকে সুলতানী যুগ বলা হয়।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ কুতুব-উদ্দিনের আমলের সুলতানী রাজ্য আরও বিস্তৃত হয় **ইলতুৎমিসের** সময়ে। রাজপুতানার একাংশ, উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চল, মূলতান ও সিন্ধু দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এখানে এক শাসন-কাঠামো গড়ে তোলা হয়। ইলতুৎমিস সুলতানরূপে বোগদাদের খলিফার অনুমোদন পান। তাঁর কন্যা **রাজিয়া** সুলতানা হ’য়ে আমীর-ওমরাহদের চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। আমীর-ওমরাহদের দমন আর সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা করে দিল্লীর গৌরব ফিরিয়ে আনেন **গিয়াসুদ্দিন বল্‌বন্‌**।

ভারতব্যাপী দিল্লী-সাম্রাজ্য বিস্তারের গৌরব কিন্তু খলজীবংশীয় **আলাউদ্দিনের**। তিনি গুজরাট, রনথম্ভোর, মেবার প্রভৃতি রাজপুত রাজ্য এবং তাঁর সেনাপতি **মালিক কাফুর** দেবগিরি, বরঙ্গল, হোয়সল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য জয় করে সারা ভারতব্যাপী দিল্লীর আধিপত্য স্থাপন করেন। আলাউদ্দিন সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ভূমিরাজস্ব নীতি ও সামরিক সংস্কার পরের সুলতান ও সম্রাটদের প্রভাবিত করেছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে শাসনের ওপর মুসলমান মোল্লাদের প্রভাব খর্ব করা।

আলাউদ্দিন

ধর্মগুরুদের প্রভাব থেকে রাজনীতিকে তিনি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আলাউদ্দিনের একনায়কতন্ত্রের পিছনে জনসমর্থন ছিল না, তাই তাঁর মৃত্যুর পর বালুকার ওপর রচিত ইমারতের মত খলজী শাসন ভেঙ্গে পড়লো আর তুঘলকেরা বসলেন দিল্লীর সিংহাসনে।

মোটামুটিভাবে খলজী সাম্রাজ্যের ওপর তুঘলকদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত হ'লো। এই বংশের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন **মহম্মদ্-বিন-তুঘলক**। তাঁর চিন্তাধারা সে যুগের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী ছিল। সুন্দর সুন্দর সংস্কার সাধন করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু সেই ভাবনাকে কার্যকরী করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। চীনা রাজাদের অনুকরণে তিনি তামার মুদ্রা চালু করতে চাইলেন কিন্তু যাতে এ মুদ্রা কেউ জাল করতে না পারে তার কোন ব্যবস্থা তিনি নিলেন না। রাজধানী সাম্রাজ্যের মাঝখানে হওয়া উচিত বলে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করলেন কিন্তু এক জায়গার সমস্ত লোককে অন্য জায়গায় বাস করতে বাধ্য করা যায় না— এ কথা তাঁর মাথায় এ'লো না। সাধারণ বুদ্ধির অভাবে তাঁর পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হ'লো। দেশে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা আর বিদ্রোহ। পরবর্তী সুলতানেরা এই পতনের গতি রোধ করতে পারলেন না।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলের শেষ দিক থেকে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে আরম্ভ হয়। একের পর এক প্রাদেশিক রাজ্য ধীরে ধীরে দিল্লীর কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। লোদীবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিমের আমলে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সুলতানী প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শাসন প্রণালী ঃ রাজপুত আমলের শাসন কাঠামোর ওপরই সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতানেরা নিজেদের প্রয়োজনে তার সামান্য রদ-বদল করে নিয়েছিলেন। সুলতানেরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং সামরিক শক্তি ছিল সাম্রাজ্যের ভিত্তি। তাঁরা ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ ও বিচারক। তাঁরা সমস্ত রাজকর্মচারী নিয়োগ

করার মালিক ছিলেন। তাঁদের সাহায্য করার জন্য **উজীর, কাজী, কোতয়াল** প্রভৃতি আধিকারিক নিয়োগ করা হ'তো। দূরের অঞ্চল-গুলিতে সুলতানের প্রতিনিধি থাকতেন। তাঁকে **নায়েব সুলতান** বলা হ'তো। তাঁর প্রদেশের খরচ খরচা মিটিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা' তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে পাঠিয়ে দিতেন। সুলতানের আয়ের মূল উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব ও নানারকম শুল্ক। বড় বড় জমিদারদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে দেওয়া হ'তো এবং কিছু জমি সুলতানের খাসমহলরূপে থাকতো।

এই আমলে অভিজাত মুসলমানেরা, ওমরাহরা রাজ্যের সমস্ত উচ্চ-পদের অধিকারী হতেন। কখনও কখনও এঁরা এত অধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেতেন যে তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিরাই সিংহাসন লাভ করতেন। তবে ইউরোপীয় অভিজাতদের মত এঁরা বংশানুক্রমিক, সমশ্রেণীভুক্ত ও সুসংগঠিত ছিলেন না। তাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুলতানের আমলে এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট কমে যেতো।

সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন : মোটামুটিভাবে এই আমলের সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—সুলতান, ওমরাহ ও বড় বড় ভূ-স্বামী আর জনসাধারণ বা কৃষক, শ্রমজীবী ও ক্রীতদাস। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ছিল না তা নয়, তবে তাদের অবস্থা জনসাধারণের চেয়ে খুব একটা পৃথক ছিল না। তখন মধ্যবিত্ত বলতে ছোট ব্যবসায়ী, নিম্ন রাজকর্মচারী প্রভৃতিকে বোঝাতো। শাসক সম্প্রদায় খুব আরামেই থাকতেন।

সমাজে নারীর অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। বাল্য বিবাহ, পর্দাপ্রথার প্রচলন, মহিলাদের অবরুদ্ধ জীবন যাপন এবং হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের কড়াকড়ি প্রচলিত ছিল। বড়লোকদের অনেক বদ্-অভ্যাস ছিল।

ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস ক'রতো। কৃষি ও হস্তশিল্প ছিল সে যুগের প্রধান উপজীবিকা। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির

ফলে দেশে ছিল প্রচুর সম্পদ। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদনকারী তাদের উৎপাদিত সম্পদের নামমাত্র পেতো। বড় মানুষদের হাতে জমি, বাণিজ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি আর জনসাধারণ খাজনা আর পরিশ্রমের চাপে উৎপীড়িত—এই ছিল দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা। দিল্লীর সুলতান ও প্রাদেশিক শাসন কর্তারা তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেরাই নির্মাণ করাতেন। এগুলিকে বলা হ'তো কারখানা। সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় পৃথিবীর সর্বত্র যা ঘটেছে ভারতেও তাই হয়েছে—বিলাসী সমৃদ্ধ শাসক সম্প্রদায় আর নিপীড়িত জনসাধারণ।

দ্বিতীয় পাঠঃ ভারতীয় ও ইসলামিক সভ্যতার ওপর পরস্পরের প্রভাব

মুসলমানরা যখন এ দেশে রাজ্য স্থাপন করেছিল তখন হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল তিক্ত। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করায় এবং ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের উদয়ের ফলে একের প্রভাব অন্যের ওপর পড়তে আরম্ভ করে। দুই সভ্যতার মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায় শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আন্দোলনে।

শিল্পকলাঃ সুলতানী আমলে নির্মিত ইমারতগুলোতে হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার ছাপ দেখা যায়। মুসলমানেরা ইসলামীয় স্থাপত্যের অনুকরণে মসজিদ নির্মাণ করতে চাইতেন কিন্তু অধিকাংশ শিল্পীরা ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যাই জানতেন। সুতরাং তাঁরা যে ইমারত নির্মাণ করতেন তাতে ভারতীয় ও ইসলামীয় স্থাপত্যবিদ্যার মিশ্রণ দেখা যায়। দিল্লীর **কুতুবমিনার, আলয়াই দরওজা** প্রভৃতি ইমারতে ইসলামী প্রভাব বেশী আর প্রাদেশিক ইমারতগুলিতে, বিশেষ করে গুজরাট, জৌনপুর ও বাংলায় হিন্দু শিল্পশৈলীর প্রাধান্য দেখা যায়।

সাহিত্যঃ সুলতানী আমলে ইতিহাস রচনা, মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি, অনুবাদ সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে **মিনহাজউদ্দিন** ও **জিয়াউদ্দিন বরনি** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফার্সি ভাষায় এই যুগের সবচেয়ে বড় কবি ছিলেন **আমীর খসরু**। এঁর

রচনা থেকে ভারতের সমাজ জীবনের অনেক চিত্র পাওয়া যায়। কাশ্মীরের **জৈনুল আবেদিনের** পৃষ্ঠপোষকতায় আরবী ও ফারসী গ্রন্থাদির কাশ্মীরী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। বাংলার হুসেন শাহের আমলে অনেক সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ হয়েছিল। সুলতানী আমলে হিন্দী, মারাঠি, পাঞ্জাবী, বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং উর্দু ভাষার সূচনা হয়।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ : হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল একটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়—ইসলামের ক্ষেত্রে শুফীবাদ ও হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ। সুফী ভাবধারা হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ভক্তিবাদের ওপর ইসলামের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাম্য, মানব প্রেম ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে ভক্তি—এই ছিল দুই মতবাদের মূলকথা।

শ্রীচৈতন্য

চৈতন্যদেব : বাংলায় ভক্তিবাদের ব্যাখ্যাতা চৈতন্যদেব নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে অধ্যাপনা করতেন। মাতার নাম ছিল শচীদেবী। তাঁর আসল নাম ছিল বিশম্ভর। লোকে আদর করে নিমাই, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নামে তাঁকে ডাকতো। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তিনি গৌড়, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন প্রভৃতি দেশ পর্যটন করে তাঁর প্রেমধর্ম প্রচার করেন। নীলাচলে (পুরীতে) তাঁর দেহান্ত হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা প্রভৃতি ছিল তাঁর বাণী। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। বহু মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জনসাধারণের ওপর তাঁর শিক্ষার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। চৈতন্যদেবকে বৈষ্ণব মতবাদের একটা স্তম্ভ মনে করা হয়।

নানক : চৈতন্যের সমসসাময়িক ছিলেন নানক। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের এক ছোট ব্যবসায়ীর পুত্র। প্রথম জীবন থেকেই ছিল তাঁর ধর্মের ওপর আসক্তি। কিছু দিন ব্যবসায় করবার পর তিনি সংসার ছেড়ে ফকিরের বেশে আফগানিস্থান, পারস্য ও মক্কা অবধি গিয়েছিলেন। ঈশ্বর এক এবং সর্বত্র আছেন এই হচ্ছে তাঁর শিক্ষার মূল কথা। তিনি কোন জাতিভেদ বা ধর্মভেদ মানতেন না। অনেক মুসলমানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তা' শিখধর্ম নামে পরিচিত। শিখ কথার অর্থ শিষ্য। তাঁর অনেক উপদেশ **গ্রন্থসাহেব** নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা আছে।

নানক

কবীর : কবীরের জন্ম পরিচয় সঠিক জানা যায় না। বলা হয় যে তিনি ছিলেন একজন পরিত্যক্ত ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু এক মুসলমান জোলার কাছে তনি প্রতিপালিত হন। বড় হ'য়ে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁরও দৃষ্টিতে ঈশ্বর এক—আল্লাহ্, রহিম এবং রাম-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁর বাণীগুলি কবীরের "দোঁহা" নামে পরিচিত। এটি হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর মতবাদে বিশ্বাসীরা কবীর পন্থী নামে পরিচিত।

কবীর

তৃতীয় পাঠ : ইলিয়াস ও হুসেন শাহী আমলের বাংলা

চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তখন ইলিয়াস ও হুসেন শাহী সুলতানেরা এখানে রাজত্ব করতেন। এঁদের

রাজ্যের সীমানা সময়ে সময়ে বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসামের অংশ বিশেষেও বিস্তৃত হয়েছিল।

সমাজঃ এই সময়ে বাংলার সমাজ জীবনে হিন্দু-মুসলমানে একটা বোঝাপড়ার ভাব লক্ষ্য করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও বেশ-ভূষাতে পরিবর্তন দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যে দাড়ি রাখার প্রচলন হয়। তারা আরবী-ফারসি শিখলো। বাংলার মাটিতে হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে গড়ে উঠলো মোল্লা, পীর ও ফকিরের দল। পীর ও ফকিররা হিন্দুদের কাছে সমাদর পেতেন। পীরের দরগায় হিন্দুরা মানতও ক'রতো। মুসলমানেরা তাবিজ, 'জলপড়া' এমন কি পীর পূজাও আরম্ভ ক'রলো। হিন্দুদের মধ্যে সত্যনারায়ণ পূজার প্রচলন পীরপূজা থেকেই এসেছে। কায়স্থ **গোপীনাথ বসু** ও **পুরন্দর খাঁ** এবং ব্রাহ্মণ **রূপ** ও **সনাতন** উচ্চ রাজপদে আসীন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ সামন্ত **গণেশ** মুসলমান রাজসভায় সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নামে ষোলো বছর রাজত্ব করেছিলেন। যেহেতু এই ধর্মান্তরিত রাজা অবাধে এতদিন রাজত্ব করতে পেরেছিলেন তার থেকে মনে হয় মুসলমান অভিজাতদের বিশ্বাস তাঁর ওপর ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিয়োগ করতেন এবং তাঁর রাজসভাতে একজন পুরোহিত ছিল। তাঁর মুসলমান হওয়া নিয়ে হিন্দু সমাজে কোন চাঞ্চল্য বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। হ'লে এই ধর্মত্যাগীর সঙ্গে হিন্দুরা সহযোগিতা ক'রতো না।

সংস্কৃতিঃ বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই সময় ছিল একটা উল্লেখযোগ্য যুগ। **রুকন উদ্দিন বরবর শাহ্, হুসেন শাহ্** ও **নসরৎ শাহ্** বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন সুকবি ছিলেন এবং পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। তিনি চীনের সম্রাটের সঙ্গে পত্র ও দূত বিনিময় করতেন। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ পণ্ডিত **মহারত্ন ধর্মরাজ** চীনে গিয়েছিলেন।

সংস্কৃতঃ এই যুগে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের চর্চা ও সমাদর ছিল।

নবদ্বীপ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানে টোল ও চতুষ্পাটী (যেখানে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও দর্শন পড়ানো হয়) ছিল। ন্যায়শাস্ত্রের চর্চার জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। **রঘুনাথ শিরোমণি** একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তাঁর রচিত **ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি** আজও পাঠ করা হয়। রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত রচনাগুলিও খুব বিখ্যাত।

বাংলা সাহিত্য : যে **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে** মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন বলা হয় তা' নিঃসন্দেহে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত। যে **কৃত্তিবাসী রামায়ণ** আজও বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত তাও এই আমলের রচনা। মালাধর বসু ভাগবতের কিছু কিছু অংশ অবলম্বন করে **শ্রীকৃষ্ণবিজয়** কাব্য রচনা করেন। তিনি সুলতানের (রুকন উদ্দিন বরবর শাহ্ অথবা হুসেন শাহ্) কাছ থেকে গুণরাজ খাঁ উপাধি পান। এ যুগে মনসামঙ্গল কাব্যের কয়েকজন বিখ্যাত কবি—**হরিদাস, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই ও নারায়ণ দেব** আবির্ভূত হয়েছিলেন। নসরৎ শাহের আমলে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে **কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী** মহাভারতের কয়েকটি পর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

স্থাপত্য : স্থাপত্য শিল্পেও এ যুগের অবদান বড় কম নয়। পাণ্ডুয়ার **আদিনা মসজিদ,** গৌড়ের **বড়া ও ছোটা সোনা মসজিদ, কদম রসুল,** খুলনার কাছে বাগেরহাটের **ষাট গুম্বজ** প্রভৃতি ইমারতগুলি এ যুগের স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অর্থনৈতিক অবস্থা : **ইবন বতুতার** বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই আমলে জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। এক মণ চালের দাম ছিল দু' আনা আর এক পয়সায় একটা মুর্গী পাওয়া যেতো। পাঁচ জনের একটা সংসার মাসিক এক টাকা ব্যয় করে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতো। বড়লোকেরা সোনার বাসনকোসন ব্যবহার ক'রতো। আর একজন বিদেশী পর্যটক **বার্থেমা** লিখেছেন যে বাংলা প্রদেশ এই সময়ে সূতীর বস্ত্র, আদা, চিনি, শস্য ও সর্বপ্রকার মাংসের জন্য পৃথিবীর

সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। **মাউহান ও বারবোসা** লিখেছেন যে বাংলার বন্দরগুলি রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশ এত সমৃদ্ধ হ'লেও সাধারণ মানুষ কতটা সমৃদ্ধি ভোগ ক'রতো তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জিনিষপত্র সস্তা হ'লেও সাধারণ মানুষ টাকা পয়সার অভাবে কষ্টেই থাকতো। আর দুর্ভিক্ষ হ'লে জিনিষের দাম বেড়ে যেতো। তখন সাধারণ মানুষের কষ্টের সীমা থাকতো না।

অনুশীলনী :

১। মুখে মুখে উত্তর দাও :
(ক) দিল্লীতে কবে সুলতানী রাজত্ব আরম্ভ হয়?
(খ) সুলতানী আমলে দিল্লীর সিংহাসনে কয়টি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল?
(গ) দিল্লীর কোন্ সুলতান প্রথম দক্ষিণ ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করেন?
(ঘ) সুলতানী আমলে মধ্যবিত্ত বলতে কাদের বোঝাতো?
(ঙ) সুলতানী আমলে নির্মিত ইমারতগুলিতে কেন হিন্দু ও ইসলামীয় সভ্যতার সংমিশ্রণ দেখা যায়?
(চ) সুলতানী আমলে ফারসী ভাষায় সবচেয়ে বড় কবি কে ছিলেন?
(ছ) কবীরের বাণীগুলি কী নামে পরিচিত?
(জ) মালাধর বসুর রচিত কাব্য গ্রন্থের নাম কি?
(ঝ) মনসামঙ্গল কাব্যের দু'জন বিখ্যাত কবির নাম কর।
(ঞ) কোন্ কাব্যকে মধ্যযুগের বাংলার প্রথম নিদর্শন ধরা হয়?

২। নানক কে ছিলেন? তাঁর প্রচারিত ধর্মকে কি বলা হয়? তিনি কি প্রচার করেছিলেন?

৩। কোন্ কোন্ বিদেশী পর্যটকের বিবরণ থেকে মধ্যযুগের বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায়? তাঁরা কি লিখেছেন?

৪। চৈতন্যদেবের কোথায় জন্ম হয়? তাঁর বাণী কি ছিল?

চতুর্দশ অধ্যায় | মধ্যযুগের অবসান

প্রথম পাঠঃ কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতন ও তার প্রভাব

যখন চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা তুর্কীস্থান আক্রমণ করে তখন তুর্কীদের একটা দল নিজেদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মরুভূমি ও পাহাড় অতিক্রম করে তারা এশিয়া-মাইনরে এসে পৌছায়। এরা আনাতোলিয়া প্রদেশে বসতি স্থাপন করে। এখানকার প্রথম স্বাধীন নরপতির নাম ছিল **ওসমান** বা **অটোমান**। ইতিহাসে এই রাজবংশ ওসমানী বা অটোমান নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও তুর্কী ভাষাভাষী। কালক্রমে এরা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ম্যাসিডোনিয়া, এপিরাস, ইলিরিয়া, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া এদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এরা এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লও অধিকার করে।

কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতন ও খ্রীষ্টান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিলোপ থেকেই অনেকে মধ্যযুগের অবসান এবং বর্তমান যুগের সূচনা গণনা করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে এখানকার গ্রীক পণ্ডিতেরা ইউরোপে চলে আসেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয়দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। এই জাগরণ যুক্তিবাদী ইউরোপের পটভূমি তৈরী করে এবং আধুনিক যুগের সূচনা করে। আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন না কারণ এর প্রায় দেড়শো বছর আগে থেকেই ইউরোপে বর্তমান যুগের সূচনা হয়েছে। ইটালীতে অনেক দিন আগে থেকেই রেনেসাঁস বা নবজন্ম আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। কেউ কেউ আবার বলেন যে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পতনের ফলে সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য-পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং এই বাণিজ্য-পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই ইউরোপীয়রা নতুন নতুন বাণিজ্য-পথের সন্ধান করতে লাগলেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই পঞ্চদশ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কার সংঘটিত হয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই গুরুত্বও মানেন না, কারণ তুর্কীরা প্রাচ্যের বাণিজ্য-পথ

বন্ধ করে দিয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। আর পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকেই ইউরোপে নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। তবে একথা মানতেই হবে, যে রেনেসাঁস ইউরোপে আরম্ভ হয়েছিল তা' তখন অনেক গ্রীক পণ্ডিতদের আগমনের ফলে জোরদার হয়। আর প্রায় হাজার বছরের পুরানো সাম্রাজ্যের বিলুপ্তিও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়।

দ্বিতীয় পাঠ: অবসানের পথে মধ্যযুগ (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী)

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে মধ্যযুগীয় অর্থনীতি, সমাজ, শাসন ও সর্বোপরি মানসিকতাতে ফাটল ধরেছে এবং তা ভেঙ্গে পড়ছে।

মধ্যযুগীয় অর্থনীতির মূল কথা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই অর্থনীতিতে ফাটল ধরে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে। ক্রুসেডের পর থেকে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে নতুন এক বিত্তশালী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়—এঁরা নিজের জীবিকার জন্য ভূমির ওপর নির্ভর করতেন না। এর সঙ্গে সঙ্গে সার্ফেরাও মুক্তিলাভ ক'রে স্বাধীন শ্রমিকে রূপান্তরিত হন। এই পরিবর্তন প্রথমে নগরগুলিতে দেখা যায়, পরে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবী বা ইউরোপের সর্বত্র যে সার্ফরা তখনই মুক্তি লাভ করে তা' নয়, তবে বেশ কিছু স্থানে তারা মুক্তিলাভ করে স্বাধীন শ্রমিকে পরিণত হয়। কোথাও সামন্ত প্রভুরা রাষ্ট্রের সহায়তায় তাদের দমন করবার চেষ্টা করেন, যেমন ইংলণ্ডের কৃষক বিদ্রোহ। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে অনুরূপ বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এর আগেই বেশ কিছু সার্ফ সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত স্বাধীন প্রজাতে যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সামন্ত অভিজাতদের ক্ষমতা অনেক স্থানে হ্রাস পায় এবং নতুন উঠতি বিত্তশালীরা সামন্তদের বিরুদ্ধে রাজাকে সমর্থন করেন। এর ফলে আমরা বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থান দেখতে পাই;

যেমন ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি। সামন্ততন্ত্র যেখানে যত শক্তিশালী সেখানে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা তত কম হ'তে বাধ্য। আর একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে এই সব রাষ্ট্র একটা জাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ; যেমন ফরাসী জাতির রাজ্য ছিল ফ্রান্স, পর্তুগীজদের রাজ্য পর্তুগাল ইত্যাদি। ওলন্দাজরাও নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই আমলে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

মধ্যযুগের মানসিকতাতেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। মধ্যযুগের মানুষ নিজেকে ধর্মের অনুশাসনে বেঁধে রাখতো। তখনকার পণ্ডিতেরা কোন কিছু প্রমাণ করতে হ'লে ধর্মশাস্ত্রের সমর্থন খুঁজতো এবং তাদের বক্তব্য নজির দিয়ে প্রমাণ ক'রতো। কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ঘটে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাচীন (বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন) সাহিত্য ও শিল্পের পুনরুভ্যুদয়ের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পের নবজীবন লাভ হয়। **পেত্রার্কা** (১৩০৪-১৩৭৪ খ্রীঃ) নানা দেশ ঘুরে ঘুরে প্রাচীন ল্যাটিন পুঁথি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ইটালীবাসীদের মনে বিস্মৃত ও অবহেলিত ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষ মহাকবি **ভার্জিল** এবং **সিসেরো, লিভি** প্রমুখ প্রসিদ্ধ রোমান পণ্ডিতদের রচনা পাঠ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে ওঠে। ভার্জিলের বন্ধু **বোক্কাচ্চিও** (১৩১৩-৭৫ খ্রীঃ) গ্রীক সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে **ক্রাইসোলোরাস্** নামে একজন গ্রীক পণ্ডিতকে বাইজান্টাইন সম্রাট ইটালীতে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আসবার পর সারা ইটালীতে গ্রীক ভাষা চর্চার ধূম পড়ে যায়। প্রাচীন সাহিত্য চর্চার ফলে মানুষের মনের বন্ধ দুয়ায় খুলে গেলো। এখন থেকে সাহিত্যিকরা মানুষের মনের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে মানুষের জ্ঞানের সীমানা বেড়ে-যায়। প্রকৃতি, মানুষের

মনোবৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্য রচিত হ'তে লাগলো। এর ফলে বিভিন্ন দেশের কবি ও সাহিত্যিকরা ল্যাটিন ছেড়ে নিজেদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করতে লাগলেন। ত্রয়োদশ শতকেই মহাকবি **দাঁন্তে** তাঁর 'ডিভাইনা কমেডি' মাতৃভাষায় রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে মধ্যযুগের সাহিত্যের মত স্বর্গ-নরক ইত্যাদির কথা থাকলেও মানব-প্রীতি, প্রকৃতি-প্রেম প্রভৃতির নিদর্শন এতে দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি এই যুগেই সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের শিল্পীরা ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। কোন সাধু সন্তের মূর্তি বা চিত্র প্রস্তুত করতে হ'লে তাঁদের ঘাড় খুব লম্বা করতেন অর্থাৎ তাঁরা স্বর্গের দিকে এগিয়ে আছেন তাই প্রমাণ করতেন। কিন্তু রেনেসাঁসের শিল্পীরা জীবন-সদৃশ চিত্র বা মূর্তি নির্মাণ করতে লাগলেন। মধ্যযুগের লোকেরা জীবন কষ্টের বলে মনে করতেন এবং কী করলে পরলোকে অনন্ত সুখ পাওয়া যাবে তারই চিন্তায় বিভোর থাকতেন। জীবন সুন্দর, পৃথিবী আনন্দের এবং পৃথিবীতে স্বর্গ আছে—এই সব ধারণার তখনই সৃষ্টি হয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এই ধারণাগুলিকে ভাষা ও শিল্পকলার মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

যুক্তিবাদের একটা ক্ষীণ ধারা ত্রয়োদশ শতক থেকেই ইউরোপে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই শতাব্দীতেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **পিটার আবেলার্ড** বলেছিলেন যা সত্য বলে চলে আসছে সেটাই সত্য বলে স্বীকার করা উচিত নয়—যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় তাই গ্রহণ করা উচিত। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তি অনেক বড় প্রমাণ। তাঁর **"হাঁ ও না"** নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন। **রোগার বেকন** নামে একজন পণ্ডিত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, সারা জীবন ধরে গ্রন্থ পড়ার চেয়ে এক ঘণ্টা প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করে জ্ঞানলাভ করা উচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই মহাজ্ঞানী ব্যক্তি নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু

রেনেসাঁসের সময় থেকেই প্রথমে ইটালীর নগরগুলি, তারপর আস্তে আস্তে অন্যান্য স্থান ও দেশ তাঁদের প্রদর্শিত পথেই চলতে লাগলো এবং সমস্ত ইউরোপে যুক্তিবাদের জোয়ার এলো। এর ফলে মধ্যযুগের ধর্মীয় ধারণা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও মূল্যবোধ আস্তে আস্তে ভেঙে পড়তে লাগলো। বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী মানুষের সৃষ্টি হ'লো।

রেনেসাঁসের ফলে মানুষের মোহমুক্তি ঘটে অজানাকে জানবার আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবার প্রচেষ্টাতেও সমুদ্রযাত্রা করতে আরম্ভ করলেন ইউরোপীয় নাবিকেরা। রেনেসাঁসের প্রারম্ভেই নাবিকের দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র, সমুদ্র-যাত্রার নক্‌শা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর ফলে নাবিকদের সমুদ্রযাত্রা আগের চেয়ে অনেক সুগম হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষে ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা আফ্রিকার উপকূল, ভারত, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমুদ্রপথে আবিষ্কৃত হয়। নতুন আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলো, ইউরোপীয় রাষ্ট্র-গুলির ক্ষমতা বাড়লো আর ইউরোপীয় সভ্যতা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইউরোপ তার ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর ইউরোপ সৃষ্টির জমি পঞ্চদশ শতকের শেষেই সৃষ্টি করেছিল। তাই বলা হয়, পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপের বেশ কিছু অঞ্চলে বর্তমান যুগের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়।

অনুশীলনী

১। কোন্ সালে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল নগরী তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত হয়?

২। কন্‌স্টান্টিনোপল নগরীর পতনের পরেই কী ইউরোপে রেনেসাঁস আরম্ভ হয়?

৩। (ক) ডিভাইনা কমেডি কে লিখেছিলেন?

(খ) চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোন্ কোন্ জাতীয় রাষ্ট্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? চারটি রাষ্ট্রের নাম কর।

(গ) রোগার বেকনের নাম কেন উল্লেখযোগ্য?

(ঘ) পেত্রার্কা কে ছিলেন? ইতিহাসে তিনি কেন বিখ্যাত?

(ঙ) পঞ্চদশ শতকে কোন্ কোন্ পণ্ডিত প্রাচীন গ্রীক ভাষা চর্চার জন্য বিখ্যাত?

৪। টীকা লিখ: (ক) রেনেসাঁস, (খ) ভৌগোলিক আবিষ্কার, (গ) কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতন।